গোস্বামীর সাগরযাত্রা

বা

বাঙ্গালা বই।

(গল্প ও সমালোচনা।)

নবদুর্গা, বাঁশরী, প্রভৃতি পুস্তকের গ্রন্থকার দ্বারা বিরচিত।

"বড় সাধ করি সাগর ছেঁচিনু,
মাণিক পাবারি আসে।
সাগর শুকালো, মাণিক লুকালো,
অভাগী কপাল দোষে।"

(২)

কলিকাতা।

ব্যবসায়ী যন্ত্রে
শ্রীঅমৃতলাল ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯১ সাল। ১৮৮৫

মূল্য চারি আনা। মফস্বলে ডাকমাশুল লাগিবে না।
(কলিকাতা—বি, কে, দাস এবং কোম্পানির নিকট প্রাপ্তব্য।)

গোস্বামীরসাগরযাত্রা

বা

বাঙ্গালা বই।

(গল্প ও সমালোচনা।)

নবদুর্গা, বাঁশরী, প্রভৃতি পুস্তকের গ্রন্থকার দ্বারা বিরচিত।

"বড় সাধ করি সাগর ছেঁচিনু,
মাণিক পাবারি আসে।
সাগর শুকালো, মাণিক লুকালো,
অভাগী কপাল দোষে।"

(২)

কলিকাতা।

ব্যবসায়ী যন্ত্রে
শ্রীঅমৃতলাল ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯১ সাল। ১৮৮৫

মূল্য চারি আনা। মফস্বলে ডাকমাশুল লাগিবে না।
(কলিকাতা—বি, কে, দাস এবং কোম্পানির নিকট প্রাপ্তব্য।)

গোস্বামীরসাগরযাত্রা

অথবা

বাঙ্গালা বই।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গঙ্গাসাগর।

পৌষ মাসের সংক্রান্তি। বেলা আড়াই প্রহর হইতে যৎকিঞ্চিৎ বাকী। নবদ্বীপের দ্বীপচাঁদ গোস্বামী সাগর-সঙ্গম তীর্থে গমন করিয়াছেন। সঙ্গে শিষ্য সেবক কেহই নাই, পরিবার ছাড়া এক জন তল্পিদার ভাণ্ডারী আছে। রৌদ্রে গোঁসাইজী সমুদ্রকূলে বালির চড়ার উপর একাকী বসিয়া আছেন। মনে কি ধ্যান, কেহই বলিতে পারে না। সাগর-তরঙ্গের দিকে অচল দৃষ্টি। সমুদ্র শত শত তরণী বক্ষে করিয়া তরঙ্গচ্ছলে নাচিতে নাচিতে এদিকে ওদিকে যাইতেছেন। তরণীরা শত শত নরনারী বক্ষে করিয়া সাগর তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতেছে। এক দৃষ্টিতে দ্বীপচাঁদ গোস্বামী তাহাই নিরীক্ষণ করিতেছেন। উর্দ্ধ দৃষ্টি নাই, তথাপি সমুদ্রজল-তলে গগন-মণ্ডলের ছায়া দেখিতেছেন। আকাশে অনেক উচুঁতে এক ঝাঁক পাখী উড়িতেছে। কে জানে শকুনি কি চীল, কাল

কাল খয়েরের টিপের মত কতকগুলি দাগ দেখাইতেছে। নীল জলে নীল আকাশের ছায়া। ভাবুক দর্শকের দর্শনেন্দ্রিয় সেই শোভা দর্শনে নিশ্চল। নির্ম্মল পবিত্র নীল গগন। একটী ছাড়া সমস্ত পদার্থেই প্রায় কলঙ্ক থাকে, সেই কথা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্তই যেন অকলঙ্ক নীলাকাশে পক্ষীরূপ কলঙ্ক।

দ্বীপচাঁদ গোস্বামী খর্ব্বাকার, গৌরবর্ণ। হুতোম বলিয়াছিলেন, "জন্মাবচ্ছিন্নে রোগা গোঁসাই কখনও দেখি নাই।" কিন্তু এই সাগর-কূলের গোঁসাই অত্যন্ত কৃশ। চক্ষু এত বসা যে, আছে কি নাই অনুমান করা যায় না। বুকের অস্থিগুলি একে একে গণনা করিয়া লওয়া যায়। গোঁফ দাড়ি নাই। যাহারা জানে না, হঠাৎ দেখিলে তাহারা মাকুন্দ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা তিনি নন। পরামাণিকের অনুগ্রহে মুখখানি সর্ব্বদা লোমশূন্য থাকে। গলায় তিন হারা তুলসীর মালা; গাত্রে রাধা-কৃষ্ণের নাম সংযুক্ত পাদপদ্ম আঁকা হীরাবলী; হস্তে লাল বনাতের কুরজালী। বয়স অনুমান পঞ্চান্ন কি ছাপ্পান্ন বৎসর।

সাগর শোভা সন্দর্শন করিয়া ভাবুক প্রেমিক গোস্বামী প্রভু আপ্না আপ্নি যেন হেলিয়া তুলিয়া নাচিতে লাগিলেন; হৃদয়ে এক প্রকার অপূর্ব্ব নবীন ভাবের আবির্ভাব! কেহ শুনিতেছে কি না, সে জ্ঞান নাই। আপ্না আপ্নি মোহন স্বরে গাইতে লাগিলেন—

> "প্রলয়-পয়োধি-জলে ধৃতবানসি বেদং।
> কেশব ধৃত-মীন-শরীর জয় জগদীশ হরে॥"

বীরভূমের জয়দেবকে মনে পড়িয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে শ্রীমতী রাধা কুঞ্জে কুঞ্জে যেমন রোদন করিয়াছিলেন, পশু, পক্ষী,

তরু, লতা, গিরি, নদী, সকলকে যেমন মাধবের মধু-বার্ত্তা সুধাইয়া ছিলেন, সেই কথাগুলি মনে পড়িল। মানিনী বিরহিণী রাধিকা আকাশে কাল মেঘ দেখিয়া এক দিন কৃষ্ণ বলিয়া ধরিতে গিয়াছিলেন। সম্ভব কি অসম্ভব, প্রেমিক পাঠক যেন জিজ্ঞাসা না করেন। বিরহের অবস্থায় সে কথার বিচার-মীমাংসা থাকে না; গোকুল-বিহারী নন্দদুলাল আর ব্রজেশ্বরী প্যারী সুখে থাকুন, তাঁহারা জানিতেন। মহা গর্ব্বিত মহাকবি জয়দেব তাঁহাদের মনের কথা জানিয়া কি না জানিয়া টানিয়া আনিয়াছিলেন। সেই আকর্ষণের নাম গীত গোবিন্দ। প্রভুর চক্ষে দুই ফোঁটা জল পড়িল।

পৌষ মাসের সূর্য্য মকরে প্রবেশ করিতেছেন; ব্রাহ্মণকে অতি তপ্ত করিতে পারিতেছেন না। পৃষ্ঠে সূর্য্যতাপ অবিচ্ছেদে স্পর্শ হইতেছিল। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ হইলে কেহই কখনও সে উত্তাপ সহ্য করিতে পারিত না। শীতকাল বলিয়া গোঁসাইজী অক্লেশে তাহা সহ্য করিতেছিলেন। বিশেষ "গঙ্গা সাগরের শীত," এ দেশের স্ত্রী-পরম্পরায় এই ন্যায্য কথা অতি প্রসিদ্ধ।

দেখিতে দেখিতে এক খানি নৌকা ডুবিয়া গেল। ঝড় নাই, তুফান নাই, শীতকালের সাগর অতি প্রশান্ত, অকস্মাৎ নৌকা ডুবিল কেন? কেন,কে বলিবে! ত্রাহি ত্রাহি ক্রন্দন-ধ্বনি উঠিল। কাণ্ডারীরা তিনটী উলঙ্গ মূর্ত্তি তুলিল। পঁচিশ জনের মধ্যে বাইশ জনকে পাওয়া গেল না। গোঁসাইজী তাহা দেখিলেন। মন অন্য দিকে ছিল; কিন্তু হাতীর মাথায় অঙ্কুশ মারিলে সে যেমন স্বেচ্ছাগতি পরিত্যাগ করিয়া মাহুতের নির্দেশবর্ত্তী

হয়, মানুষের মন তেমনি একটু কিছু শোকাহত হইলে, পৃথিবীর চিন্তা ভুলিয়া অতীন্দ্রিয় লোকের অনুধাবনা করে।

ভাবিতে ভাবিতে গোঁসাইজী চমকিয়া উঠিলেন। কথা আছে, শব দর্শনে তত্ত্বজ্ঞান। ভাবুক দর্শকের অন্তরে তত্ত্বজ্ঞানের সঞ্চার হইল। সাগরের দিকেই দৃষ্টি ছিল, নড়িল না, ফিরিল না, সমভাবে অচঞ্চল।

হটাৎ একটা কাক আসিয়া শব-দেহের বুকের উপর উড়িয়া বসিল। বক্ষের মাংস চঞ্চুপুটে টানিয়া ক্রমে ক্রমে একটী চক্ষু উৎপাটন করিয়া লইল। গোঁসাইজী নির্জল স্থির নেত্রে সেই বীভৎস দৃশ্য দেখিলেন।

সহসা চমক ভাঙ্গিল। পৌষ মাসের সংক্রান্তির রাত্রি, তাহাতে সমুদ্রকূল, বৃক্ষ লতা কাঁপাইয়া সাগরে ঢেউ দিয়া দিয়া উত্তরানিল ধীরে ধীরে সঞ্চরণ করিতেছে। পবনের খেলা দেখিয়া, আকাশে চন্দ্র দেখিয়া, প্রশান্ত গম্ভীর-প্রকৃতি জলনিধি আনন্দে ফুলিয়া ফুলিয়া যেন নৃত্য করিতেছে। গোঁসাইজী যোগাসন পরিত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। তখন তাঁহার কৃশ শরীরে শীতানুভব হইল। তিনি এক খানি তরণীতে আরোহণ করিলেন। তরণীমধ্যে একটী অর্দ্ধ-বয়সী স্ত্রীলোক, একটী ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা, আর একটী সপ্তদশ বর্ষীয় বালক বসিয়াছিল। স্ত্রীলোকটী গোস্বামী-প্রভুর ধর্ম্মপত্নী; বালিকাটী তাঁহাদের দুহিতা, আর সেই বালকটী তাঁহাদের ভাবী জামাতা।

গোঁসাইজী তরণী-মধ্যে প্রবেশ করিলে, তাঁহার পত্নী সযত্নে এক খানি নীলবর্ণ বালাপোষ বাহির করিয়াদিলেন; বালাপোষখানি গোঁসাইজীর গাত্রে হীরাবলীর স্থান অধিকার

করিল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, প্রভুর তখনও সন্ধ্যা বন্দনাদি করা হয় নাই। ব্রাহ্মণী কোশা-কুশী আনিয়া দিলেন। প্রভু প্রায় চারি দণ্ড রাত্রির সময় সায়ংকালীন সন্ধ্যা উপাসনা সমাপ্ত করিলেন। উপাসনান্তে যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ করা হইল। গৃহিণীর সহিত অধিক কথাবার্ত্তা হইল না। গোস্বামীর মন অন্য দিকে ছিল। অন্যান্য কারণে যত না হউক, বিনা তুফানে সাগরে তরণী মগ্ন হইয়া তাঁহার অন্তরে করুণার সঞ্চার করিয়া দিয়াছিল। আরও ভাসমান শব দর্শনে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়াছিল। মনে মনে তিনি সংসারের নশ্বরতা চিন্তা করিতেছিলেন। মানব দেহের ক্ষণ-ভঙ্গুরতা তাঁহার হৃদয়-সমুদ্রে যেন তরঙ্গিত হইয়া আন্দোলিত হইতেছিল, অন্যমনস্ক হইয়া কেবল তাহাই তিনি ভাবিতেছিলেন। (আসিলেই যাইতে হয়, জন্মিলেই মরিতে হয়, ইহা সকলেই জানে; কিন্তু সকল সময় মনে থাকে না।) যাইলে আবার আসিতে হয় কি না, মরিলে আবার পুনর্জ্জন্ম হয় কি না, এ তর্কে অনেক বিসম্বাদ আছে।) মানুষ মরিয়া কি হয়, এ পর্য্যন্ত কেহই তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন নাই। আমাদের দয়াময় ঋষিগণ ত্রিকালজ্ঞের ন্যায় সকল কথাই বলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু আমরা একটী আশ্চর্য্য দেখি, তাদৃশ সারবান্ সাধু পুরুষদিগেরও মতের পরস্পর ঐক্য নাই। অন্যান্য দেশের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতেরাও পুনর্জ্জন্ম সম্বন্ধে মীমাংসা করিতে সমর্থ হন নাই। বাস্তবিক মানুষ মরিয়া জগতে আবার ফিরিয়া আইসে কি না, ইহার স্বরূপ সিদ্ধান্ত করা নিতান্ত সহজ বলিয়া বোধ হয় না।)

এক জন বাঙ্গালী কবি বলিয়া গিয়াছেন—

" মরে যদি ফিরে আসি, মনে যদি রয়।
তবে ত বলিতে পারি, মরিলে কি হয়॥"

এ কথাটী এক প্রকার অকাট্য। গোঁসাইজী তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন, কিম্বা তাঁহার চিন্তার উপকরণ আর কিছু, একথা আমরা বলিতে পারি না। ফলে তিনি অন্যমনস্ক ছিলেন। অনেকক্ষণ পরে সমুদ্রের দিকে চাহিয়া একটী নিশ্বাস ফেলিলেন। বালকের দিকে চাহিয়া কিঞ্চিৎ স্তম্ভিতস্বরে কহিলেন, "সোমনাথ! তোমরা যে ইংরাজী বিদ্যাভ্যাস কর, তাহাতে কি এমন কোন তত্ত্ব পাওয়া যায় যে, যাহার দ্বারা মানুষের পরকালের গতি নির্ণীত হইতে পারে?"

বিজ্ঞতম গোঁসাইজীর এ প্রশ্নটী ঠিক যেন উন্মত্ত-প্রলাপবৎ বোধ হইল। সোমনাথ সপ্তদশ বর্ষীয় বালক, একটী পল্লীগ্রামস্থ সামান্য বিদ্যালয়ের ছাত্র। তাহার পক্ষে তত বড় গুরু প্রশ্নের উত্তর দান করা কত দূর কঠিন, ও কত দূর অসম্ভব, চৈতন্যবিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেই তাহা বুঝিতে পারেন। সোমনাথ একটু হাস্য করিয়া গোঁসাইজীর গৃহিণীর মুখের দিকে চাহিল। গৃহিণীও অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, ইনি কেবল রাশি রাশি পুঁথি পড়িয়া কেমন এক প্রকার বিহ্বল হইয়া গিয়াছেন। তিনি ভাবিলেন বটে, কিন্তু প্রভু তাহা ভাবিলেন না। প্রভু ভাবিলেন, "আমাকে ইহার মীমাংসা করিতেই হইবে। সংস্কৃত ধর্ম্ম শাস্ত্র অনেক দেখিয়াছি। আভাস পাইয়াছি, কিন্তু মীমাংসা পাই নাই। আমরা গোস্বামী, ইংরাজী শিক্ষা করি নাই, ম্লেচ্ছ কেতাব স্পর্শ করিলে আমাদের পবিত্রাত্মা কলুষিত হয়; সুতরাং সে ভাণ্ডারে যদি কিছু রত্ন

থাকে, তাহা আমরা গ্রহণ করা দূরে থাকুক, দর্শন করিবারও অনধিকারী। অধুনা—অধুনাই বা কেন, বহু পূর্ব্বাবধি এতদ্দেশে বাঙ্গালা সাহিত্য কাব্যের আলোচনা হইতেছে। এই ভাষায় অনেক পুস্তকও আছে, তাহা এক বার আলোচনা করিয়া দেখিব।” এটী কেবল তাঁহার ভাবনা নহে, মানসিক স্থির সংকল্প, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

ক্রমেই রাত্রি হইতে লাগিল। সন্ধ্যাকালে আকাশে যত নক্ষত্র উঠিয়াছিল, তত আর দেখা যায় না। নিশাকরের প্রদীপ্ত করে অনেকগুলি নিতান্ত নিষ্প্রভ। উষাকালে মালিনীরা ফুল তুলিয়া লইয়া গেলে, প্রভাতে যেমন মল্লিকা মালঞ্চে ঠাঁই ঠাঁই ছাড়া ছাড়া দুটী একটী শ্বেত পুষ্প নয়নগোচর হয়, পূর্ণ-জ্যোৎস্না যামিনীতে (কিঞ্চিৎ বেশী রাত্রে) আকাশও ঠিক সেইরূপ দেখাইতেছিল। অনেক নৌকার প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছে, দ্বীপচাঁদ গোস্বামী সপরিবারে নিশাভোজন সমাপন করিয়া যথা যথা স্থানে বিশ্রাম লাভ করিলেন।

প্রভাতে নৌকা হইতে গোঁসাই ঠাকুর দেখিলেন, পূর্ব্ব পশ্চিম দুই দিকে দুই রক্তমূর্ত্তি। পূর্ব্ব দিকে সূর্য্যদেব উদয় হইতেছেন। কৃষ্ণ প্রতিপদের চন্দ্র পশ্চিম দিকে অস্ত যাইতেছেন। চক্ষে না দেখিলে সে শোভা মুখে বলিয়া বুঝাইয়া দেওয়া যায় না। ক্রমে সুধাকর পাণ্ডুবর্ণ, ক্রমে বিলীন; সূর্য্যদেব সুপ্রকাশ।

প্রভাতে উত্তরায়ণ-সঙ্গমে স্নান করিয়া

> “অচ্যুতং কেশবং বিষ্ণুং হরিং সত্যং জনার্দ্দনং।
> হংসং নারায়ণঞ্চৈব, এতে নামাষ্টকং শুভং॥”

ইতি মন্ত্রে পরমেশ্বরকে স্মরণ করিয়া গোঁসাইজী নৌকা খুলিয়া দিবার আদেশ দিলেন। কাণ্ডারীরা আদেশ পালন করিল। নানা স্থান অতিক্রম করিয়া তরণীখানি কয়েক দিনের পর যথা সময়ে নবদ্বীপের ঘাটে পৌঁছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অন্বেষণ।

গৃহস্থ গোস্বামী গৃহে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গমের প্রতিজ্ঞা স্মরণ আছে, মন স্থির করিতে পারিলেন না। মাঘ মাসের চতুর্থ দিবসে গৃহিণীকে কহিলেন, "কাত্যায়নীর বিবাহ। এমাসে একটী ভিন্ন আর দিন নাই, সে দিন ১৯এ মাঘ। আয়োজনের নিমিত্ত শীঘ্রই আমাকে সহরে যাইতে হইতেছে।"

কন্যার বিবাহে পিতা অপেক্ষা মাতার অধিক আনন্দ। গৃহিণী কহিলেন, "এখনও ত দিন আছে, দুদিন বিলম্ব কর, সাগরে কষ্ট হইয়াছে, দুদিন বিশ্রাম কর। কিন্তু মেয়ের গহনা-গুলি যেন একটু পাকা পোক্ত হয়। আর তুমি এক দিন বলিয়াছিলে, বেটের দড়ি বাঁধা রূপার পৈঁছে পরিয়া আমার জন্ম যাইতেছে, কাত্যায়নীর বিয়ের সময় একটা কিছু সোণার গহনা দিবে, তাহা যেন মনে থাকে।"

গোস্বামী হাস্য করিয়া কহিলেন, "ঘঁটে দিবার সময় রূপায় কলঙ্ক ধরে না, সোনায় ধরে।"

সে দিন আর অধিক কথা হইল না। তিন দিন অতীত হইয়া গেল। গোস্বামী ঠাকুরেরা চতুষ্পাঠীর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের ন্যায় ভোলানাথ হইয়া থাকেন না। তাঁহাদের হরেক রকম

শিষ্য সেবক থাকে; শিষ্য-সমাগমে তাঁহারা চালাক চতুর হন। ব্রাহ্মণীকে প্রবোধ দিয়া মাঘ মাসের সপ্তম দিবসে দ্বীপচাঁদ গোস্বামী মুরশিদাবাদে যাত্রা করিলেন। যাত্রা কালে ঊষা। নিবিড় কুজ্ঝটীকায় সমস্ত নবদ্বীপ অন্ধকার। আমাদের দেশের লোকে জানেন, মাঘের প্রথমে কুয়াসা আর শেষে বৃষ্টি হইলে বৎসরটী ভাল যায়। গোস্বামী ঠাকুর শুভ আশায় শুভ অবসরে কুয়াসায় যাত্রা করিলেন। আয়োজন তাঁহার যাহা, গঙ্গাসাগর তীর্থে তিনি তাহা সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। মুরশিদাবাদে পৌঁছিয়া সর্ব্ব প্রথমে বাঙ্গালা পুস্তকের অনুসন্ধান করিলেন। ভট্টাচার্য্যদিগের গৃহে গৃহে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি হস্ত লিখিত কয়েকখানি পুঁথি সংগৃহীত হইল। কেবল মুরশিদাবাদে অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। বীরভূম, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, বর্দ্ধমান, এবং কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে কয়েক মাস ভ্রমণ করিয়া অনেকগুলি পুস্তক সংগ্রহ করিলেন। ব্রাহ্মণীর নিকট যে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হইয়াছিল, তাহা মনে থাকিল, কিন্তু তদনুসারে কার্য্য হইল না। সাগর-সঙ্গমে যে কল্পনা অন্তঃকরণ মধ্যে উদিত হইয়াছিল, তাহাই সর্ব্ব-প্রধান স্থান অধিকার করিয়া রহিল। আরও কিছু দিন স্থানে স্থানে পর্য্যটন করিয়া নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করিলেন। সেখানেও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনেকগুলি গ্রন্থ হস্তগত হইল। যে সকল পুস্তক প্রাপ্ত হইলেন, তাহার অধিকাংশই ভক্তি-তত্ত্বে পরিপূর্ণ। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রূপ সনাতন, জীব গোস্বামী, গোবিন্দ দাস, জ্ঞান দাস, কবিকঙ্কণ, ক্ষেমানন্দ, কেতক দাস, রামেশ্বর

ভট্টাচার্য্য, রামপ্রসাদ সেন, ও ভারতচন্দ্র রায় প্রভৃতি কবিগণের রচনা পাঠে গোস্বামী ঠাকুরের বিশেষ আনুরক্তি জন্মিল।

স্বামী গৃহাগত হইলে গৃহিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাত্যায়নীর বিবাহের জন্য যাহা যাহা আনিতে গিয়াছিলে, তাহার কি হইল? আসিতেই বা এত বিলম্ব হইল কেন?"

গোস্বামীরা অধিকাংশ লোকের মুক্তিদাতা দীক্ষাগুরু। তাঁহারা প্রায়ই মিথ্যা কথা কহেন না, মিথ্যা কথায় পাপ হয়। শিষ্য সেবককে ইহা বুঝাইয়া দেন; সুযোগ পাইলে এক একটী সভাতেও উপদেশ দিয়া থাকেন। কিন্তু গৃহে গৃহিণীর নিকটে মিথ্যা কথা কহিলে হয়ত তত পাপ না হইতে পারে, মনে মনে এই স্থির করিয়া গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, "সমস্তই বায়না দেওয়া হইয়াছে। এক বৎসর অকাল। বৎসর পূর্ণ হইলে বিবাহ হইবে। এখন তত ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই।"

ব্রাহ্মণী শুনিলেন, মনে একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন; অথচ গোস্বামীর পত্নী, কিছু কিছু শাস্ত্র-জ্ঞান থাকা সম্ভব; অকালে কন্যার বিবাহ দিতে নাই বুঝিয়া পতিবাক্যে বাদানুবাদ করিলেন না। ব্রাহ্মণের একটা দারুণ ভয় ঘুচিয়া গেল।

পদব্রজে নানাস্থান পরিভ্রমণ করিতে অবশ্যই কষ্ট হইয়াছিল; গৃহে পৌঁছিয়া সাত আট দিবস কেবল নিত্যকার্য্য ছাড় গোস্বামী অন্য কার্য্য কিছুই করিলেন না। পতিব্রতা ব্রাহ্মণী নিত্য সায়ংকালে গরম জল করিয়া চরণ ধৌত করিয়া দিতেন, নিশা এক প্রহরের মধ্যেই আহারাদি করাইয়া শয়ন করাইতেন। ভার্য্যার সেবা-শুশ্রূষায় ভূদেব গোস্বামী শীঘ্রই সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অধ্যয়ন।

তাহার পরেই লব্ধ গ্রন্থাবলীর আলোচনা আরম্ভ। একে একে সমস্ত পুস্তকগুলি পাঠ করিলেন। যাহা অন্বেষণ করেন, কোথাও কোথাও তাহা পাইলেন, কোথাও বা তাহার খণ্ডন দেখিলেন। মনঃপূত হইল না। কোথাও বা দর্শন করিলেন, মৃত্যুর পরেই নির্ব্বাণ। বিষ্ণুভক্তদিগের একখানি ভক্তি-সাগর গ্রন্থে দেখিলেন, প্রেমেই মোক্ষ। সুতরাং বাঙ্গালার আদিকাব্য, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলীতে প্রেম গাথা অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। বিদ্যাপতির রচনায় এক স্থানে দেখিলেন—

"জনম অবধি হাম্ রূপ নিহারনু,
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনমু,
শ্রুতিপথে পরশ না গেল॥
কত মধুযামিনী রভসে গোঁয়াইনু,
না বুঝিনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু,
তবু হিয়া জুড়ন না গেল॥"

ভাল লাগিল না। সন্দেহ জন্মিল। নামাবলীতে জানু বন্ধন করিয়া মুদ্রিত নয়নে ঢুলিতে ঢুলিতে পাঠক মহাশয় মনে মনে তর্ক আরম্ভ করিলেন, "কথাটা কেমন হইল! জন্ম অবধি রূপ নিরীক্ষণ করিয়া নয়নের তৃপ্তি হইল না, ইহা এক প্রকার

বুঝা গেল; কিন্তু লাখ লাখ যুগ হৃদয়ে রাখিয়া হৃদয় জুড়াইল না, এটী ত বুঝিলাম না! জন্ম অবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত এক জন্ম, সে জন্মে লক্ষ লক্ষ যুগ আসিতে পারে না। কোন মনুষ্যই লক্ষ লক্ষ যুগ বাঁচিয়া থাকে না,তবে ত পুনর্জ্জন্ম থাকিতে পারে? জন্ম জন্ম বহু জন্ম না হইলে লক্ষ লক্ষ যুগ কিরূপে সম্ভবে! যদি ধরা যায়, ঠাকুর দেবতার কথা, তথাপি তাহাতেও ত অনুকূল যুক্তি পাওয়া যায় না। রাম অবতার, কৃষ্ণ অবতার, চৈতন্য অবতার, ইত্যাদি শাস্ত্রে যেরূপ দেখা যায়, তাহাতে ত তাঁহারা কেহই লক্ষ লক্ষ যুগ পৃথিবীতে ছিলেন না। তবে কিরূপে 'জনম অবধির' সঙ্গে 'লাখ লাখ যুগের' সমন্বয় হইতে পারে?" অনেক চিন্তা করিলেন, সিদ্ধান্ত আসিল না। পুস্তক খানি বন্ধ করিয়া কবিবর চণ্ডীদাসের একটী প্রেম গীত পাঠ করিলেন।

"কেবা নিরমিল, প্রেম সরোবর,
নিরমল তার জল।
দুখের মকর, ফিরে নিরন্তর,
প্রাণ করে টল মল॥
গুরুজন জ্বালা, জলে সিহালা,
পড়শী জীয়ল মাছে।
কুলে পানিফল, কাঁটায় সকল,
সলিল বেড়িয়া আছে॥
কলঙ্ক পানায়, সদা লাগে গায়,
ছাঁকিয়া খাইল যদি।
অন্তর বাহিরে, কুট কুট করে,
সুখে দুখ দিল বিধি॥"

ইহাই বা কি হইল ? প্রণয়ে যদি এত বাধা, এত বিঘ্ন, তবে সুখ কোথায়! মোক্ষের ত কথাই নাই। কবি আর এক স্থলে বলিয়াছেন—

"কুলবতী হৈয়া, কুলে দাঁড়াইয়া,
যে ধনী পিরীতি করে।
তুষের অনল, যেন সাজাইয়া,
সে ধনী পুড়িয়া মরে॥"

প্রেম করিলে যদি তুষানলে পুড়িতে হয়, তবে কিরূপেই বা বলি, প্রেমে মোক্ষ? অথচ সেই কবিই বলিতেছেন,

"সই পিরীতি না জানে যারা।
এতিন ভুবনে, মানুষ জনমে,
কি সুখ জানয়ে তারা?
পিরীতি লাগিয়া, পরাণ ছাড়িলে,
পিরীতি মিলয়ে তথা॥"

কবি ভাল মন্দ দুই দিক গাইতেছেন; ইহার মধ্যে কোন্‌টী ভাল, কোন্‌টী মন্দ, বাছিয়া লওয়া সকলের পক্ষে সুসাধ্য নহে। চণ্ডীদাস আর এক স্থানে লিখিয়াছেন—

"বড় সাধ করি, সাগর ছেঁচিনু,
মাণিক পাবারি আশে।
সাগর শুকালো, মাণিক লুকালো,
অভাগী কপাল-দোষে॥
কহে চণ্ডীদাস, কালার পিরীতি,
কহিতে পরাণ ফাটে।
শঙ্খ বণিকার করাত যেমতি,
যাইতে আসিতে কাটে॥"

প্রেম পাইবার নিমিত্ত আকিঞ্চন করিয়াও যদি হতাশ হইতে হয়, তাহা হইলে প্রেমে মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া কত লোকের পক্ষে সম্ভবে বিবেচনা করিয়া দেখা ভাল। বিশেষতঃ বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সমস্ত কবিতাই প্রায় রাধাকৃষ্ণ লীলা রসে পরিপূর্ণ। দেবতার সম্বন্ধে যখন এত বিচ্ছেদ, এত হতাশ সঙ্ঘটন, মানুষের পক্ষে তখন কতদূর নৈরাশ্যের সম্ভাবনা, অনায়াসেই উপলব্ধি হইতে পারে।

বাঙ্গালা বই বহু রত্নের আকর, ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্তু মানুষ মরিলে আবার মানুষ হয়, কিম্বা এক কালে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, এই দুই খানি প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যে তাহার কোন তত্ব নিরূপণ হইল না। দ্বীপচাঁদ গোস্বামী আর এক বার বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক কৃত্তিবাসের রামায়ণ, আর কাশীরাম দাসের মহাভারত অধ্যয়ন করিলেন। দেবতার অথবা মুনি ঋষির শাঁপে যাহারা ভিন্ন ভিন্ন যোনি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা ভিন্ন অপর কাহারও পুনর্জ্জন্ম বুঝিতে পারিলেন না। কবিতার তারতম্যের আলোচনা করিলেন, তাহাতে সন্তোষ লাভ হইল। কবি কৃত্তিবাসকে শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়া মনে মনে কাশীরামকে দ্বিতীয় আসনে বসাইলেন। রামায়ণের নায়ক নায়িকাগণের কীর্ত্তি কলাপ, কুরুক্ষেত্রে কুরুপাণ্ডবের করাল সংগ্রাম, অনুধ্যান করিয়া মনে মনে বিস্ময় মানিলেন; কিন্তু যাহা ভাবিতেছিলেন, অর্থাৎ মোক্ষ, তাহা পাইলেন না। এক এক বার মনে করিতেছিলেন, বিদ্যাপতির সহিত চণ্ডীদাসের কবিতার, এবং কৃত্তিবাসের সহিত কাশীরাম দাসের কবিতার তুলনা করিয়া দেখিবেন; কিন্তু

সাহস করিতে পারিলেন না। অন্য পুস্তকে হস্তার্পণ করিলেন।

প্রথমখানি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর বিরচিত চণ্ডী কাব্য। দ্বিতীয় খানি গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর। গোস্বামী যদিও জানিতেন যে, এই দুই পুস্তকে মোক্ষ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান লাভের আশা বৃথা, তথাপি অনেক কষ্টে সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া এক বার পাঠ করিতে ইচ্ছা করিলেন। পূর্ব্বে আর এক বার এই দুইখানি কাব্য তাঁহার পাঠ করা হইয়াছিল, সেই সময় কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের বিদ্যাসুন্দর খানিও দেখিয়াছিলেন। উভয় বিদ্যাসুন্দরের রচনায় ইতর বিশেষ আছে কি না, তাহার তুলনা করিতে তাঁহার ইচ্ছা হয় নাই। এক্ষণে কবিকঙ্কণের সহিত ভারতচন্দ্রের তুলনা করিতে কেন ইচ্ছা হইল, গোস্বামীর মনের কথা কে টানিয়া বলিবে?

রাত্রি প্রায় দুই প্রহর। কৃষ্ণ পক্ষের একাদশী। পৃথিবী ঘোর অন্ধকার। নবদ্বীপ নিস্তব্ধ। মধ্যে মধ্যে পেচকের বিকট চীৎকার ভিন্ন, সমস্ত পশু পক্ষী নীরব। নিশা-প্রহরী শৃগাল-পাল নিশা দ্বিপ্রহরে এক বার স্বদলে ঘোর রব করিয়া রাত্রিকে অথবা নবদ্বীপকে পাহারা দিল। আকাশের নক্ষত্রেরা অদৃশ্য নক্ষত্র-পতিকে খুঁজিবার জন্য এককালে বহু চক্ষু উন্মীলিত করিল। দীপচাঁদ গোস্বামীর বয়ক্রম ৫৫ | ৫৬ বৎসর; তিনি একটী প্রদীপের সম্মুখে বসিয়া এক বার কবিকঙ্কণ চণ্ডী, এক বার অন্নদামঙ্গল মিলাইয়া দেখিতেছেন। নেত্র এক এক বার বিকুঞ্চিত, এক এক বার বিস্ফারিত হইতেছে, ওষ্ঠদ্বয় এক এক বার আনন্দে, আর এক এক বার যেন কিছু

সংশয়ে বিকম্পিত হইতেছে। তিনি দেখিতেছেন, স্বভাব-কবি কে কেমন। মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী দরিদ্র কবি ছিলেন। দরিদ্র গৃহস্থের অবস্থা বর্ণনে প্রকৃতির সংগতি রাখিয়া তিনি যেমন কৃতকার্য্য হইয়াছেন, ভারতচন্দ্র তেমন পারেন নাই। যদিও ভূস্বামীর দৌরাত্ম্যে ভারতচন্দ্রকে নিতান্ত কষ্টে নিপতিত হইতে হইয়াছিল, তথাপি তিনি দরিদ্র সংসারকে ভালরূপে চিনিতে পারেন নাই। গোঁসাইজী প্রথমে চণ্ডীকাব্যে হর-পার্ব্বতীর কন্দল পাঠ করিলেন। গৌরী কহিতেছেন—

"রন্ধন করিতে ভাল বলিলা গোসাই।
প্রথম পাত্রে যাহা দিব তাহা ঘরে নাই॥
কালিকার ভিক্ষা নাথ উধার সুধিনু।
অবশেষে যাহা ছিল রন্ধন করিনু॥
আছিল ভিক্ষার শেষ পালি দুই ধান।
গণেশের মূষিক করিল জল পান॥
আজিকার মত যদি বান্ধা দেও শূল।
তবে যে পারিব নাথ আনিতে তণ্ডুল॥"

এই কথা শুনিয়া শিব সক্রোধে কহিতেছেন,—

"আমি ছাড়ি ঘর, যাব দেশান্তর,
কি মোর ঘর করণে।
হয়ে স্বতন্তর, তুমি কর ঘর,
লয়ে গুহ গজাননে॥
দেশে দেশে ফিরি, কত ভিক্ষা করি,
ক্ষুধায় অন্ন না মিলে।
গৃহিণী দুর্জ্জন, গৃহ হল বন,

বাস করি তরু তলে ॥

*   *   *   *

আন বাঘ ছাল, শিঙ্গা হাড় মাল,
বিভূতি ডম্বুর ঝুলি।
চল চল নন্দী, হও মোর সঙ্গী,
ঘরে না থাকিবে শূলী ॥"

গৌরী আবার কহিতেছেন,—

" কি জানি কি তপের ফলে পাইয়াছি হর।
সই সাঙ্গাতি নাহি থাকে দেখে দিগম্বর ॥
উন্মত্ত ল্যাঙ্গটা হর চিতা ধূলি গায়।
ছাড়িয়ে শিবের জটা অবনী লোটায় ॥
একাসনে শুতে নারি সাপের নিশ্বাসে।
ততোধিক পোড়ে প্রাণ বাঘ ছাল বাসে ॥
বাপের সাপ পোয়ের ময়ূর সদাই করে কেলি।
গণার মূষা কাটে ঝুলি আমি খাই গালি ॥
বলদে বাঘেতে দ্বন্দ্ব নিবারিব কত।
অভাগিনী গৌরীর দারুণ উপহত ॥ ইত্যাদি।"

হরগৌরী কন্দলে কবিকঙ্কণের এইরূপ বর্ণনা। এই বিষয়ে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের বর্ণনার কিয়দংশ উদ্ধার করা যাইতেছে। শিব কহিতেছেন—

"ভিক্ষা মাগি ভিক্ষা মাগি কাটিলাম কাল।
তবু ঘুচাইতে নারিলাম বাঘ ছাল ॥
আর সবে ভোগ করে কত শত সুখ।
কপালে আগুণ মোর না ঘুচিল দুঃখ ॥

নীচ লোকে উচ্চ ভাষে সহিতে না পারি।
ভিক্ষা মাগি নাম হৈল শঙ্কর ভিক্ষারি॥
বিধাতার লিখন কাহার সাধ্য খণ্ডি।
গৃহিণী ভাগ্যের মত পাইয়াছি চণ্ডী॥
সর্ব্বদা কন্দল বাজে কথায় কথায়।
রস কথা কহিতে বিরস হয়ে যায়॥
কিবা শুলক্ষণে হৈল অলক্ষণ ঘর।
খাইতে না পানু কভু পূরিয়া উদর॥"

শিবানী কহিতেছেন,——

"শুনিলি বিজয়া জয়া বুড়াটীর বোল।
আমি যদি কই তবে হবে গণ্ডগোল॥

* * * *

সম্পদের সীমা নাই বুড়া গরু পুঁজি।
রসনা কেবল কথা নিন্দুকের কুঁজি॥

* * * *

অলক্ষণা সুলক্ষণা যে হই সে হই।
মোর আসিবার পূর্ব্বকালী ধন কই॥
বুড়া গরু লড়া দাঁত ভাঙ্গা গাছ গাড়ু।
ঝুলি কাঁথা বাদ্য ছাল সাপ সিদ্ধি লাড়ু॥
তখন যে ধন ছিল এখন সে ধন।
তবে মোরে অলক্ষণা কন কি কারণ॥

* * * *

ভিক্ষা মাগি খুদ কনা যা পান ঠাকুর।
গণার ইঁদুর কাটে কাটুর কুটুর॥

উপযুক্ত দুটী পুত্র আপনি যেমন।
সবে ঘরে আমি মাত্র এই অলক্ষণ॥

দ্বীপচাঁদ গোস্বামী এই দুটী বর্ণনা মিলাইয়া দেখিলেন। তৎক্ষণাৎ মনে হইল, ভারতচন্দ্রে কেবল মুকুন্দরামের ছায়া। গোধিকারূপ ত্যাগ করিয়া "রাকা চন্দ্রমুখী" মূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক ভগবতী পার্ব্বতী যেরূপ কৌশলে ফুল্লরার নিকট আত্ম-পরিচয় দিয়াছিলেন, গঙ্গাতীরে ঈশ্বরী পাটনীর কাছে অভয়ার পরিচয়ে কবিবর ভারতচন্দ্র রায় যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা উহারই ছায়ামাত্র। কেবল উহাই নহে; অন্নদা মঙ্গল, বিদ্যাসুন্দরের অনেকস্থল মুকুন্দরামের অনুকরণ মাত্র। কেবল মুকুন্দরামও নহেন; গুণাকর ভারতচন্দ্র আরও দুই এক জন প্রাচীন কবির উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়াছেন।

দ্বীপচাঁদ গোস্বামী নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন না। প্রায় দুই শত বিঘা ব্রহ্মোত্তর ভূমির অধিকারী। তাহা ছাড়া শিষ্য সেবক বিস্তর, পরিবারও অল্প; সুতরাং তিনি সম্ভবমত ক্রিয়া-কলাপ নির্ব্বাহ করিয়া, সচ্ছন্দে সংসারে বাস করিতেন। তথাপি ফুল্লরার দুঃখের কথা পাঠ করিয়া তাঁহার হৃদয় এক বার কাঁপিয়াছিল। ফুল্লরার বার মাস দুঃখ শ্রবণ করিলে সত্য সত্য অশ্রুপাত না করেন, এমন পাষাণ-হৃদয় অন্বেষণ করিয়া লইতে হয়।

গোস্বামীর হৃদয় এক বার কাঁপিয়াছিল; কিন্তু বারি-বুদ্বুদের যেমন শীঘ্র বিলয় হয়, সেইরূপ সে কম্পন অচিরেই নিবৃত্ত হইল। পুনর্জ্জন্ম ও মোক্ষ আবার মনে পড়িল। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস আবার হৃদয়ে উদয় হইলেন। ইহাঁরা উভয়েই প্রেমিক

কবি। মোক্ষের হেতু প্রেম। গোঁসাইজী আর এক বার তাহাই চিন্তা করিলেন। কিন্তু প্রেম যে কি পদার্থ, তাহা ভাল করিয়া অনুধাবন করিলেন কি না, তাঁহার মানসিক সিদ্ধান্ত নিয়া সহজে কেহ তাহা স্থির করিতে পারিবেন না। এক বার তিনি স্মরণ করিলেন—

"মাটির উপরে জলের বসতি তাহার উপরে ঢেউ।
তাহার উপরে পীরিতি বসতি, ইহা কি জানয়ে কেউ॥"

জলের তরঙ্গের উপরে যে পীরিতির বাস, সে পীরিতি যে কি, সাধক প্রেমিকের নিকটে তাহার উপদেশ লইতে হয়। এই যে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ সংসার দেখিতেছ, ইহা কেবল প্রেম-পুষ্পে প্রেম-সূত্রে গাঁথা। যাঁহারা ঈশ্বর-প্রেমের পথিক, যাঁহারা সেই নিত্য প্রেমের প্রেমিক, তাঁহারা পৃথিবীর সকল পদার্থেই প্রেম দেখিতে পান। সংসারে পুরুষ প্রকৃতিতে যে প্রেম হয়, তাহাতে যদি খাদ, বাঁটা না থাকে, তাহা হইলে সেই প্রেমেও অনন্ত প্রেমময়কে লাভ করা যায়। কিন্তু যে কবি প্রেমকে সরোবর করিয়া তাহাতে নির্ম্মল জল ঢালিয়াছেন, তাহাতে আবার কলঙ্ক-পঙ্ক রাখিয়াছেন, সেহালা দিয়া কলুষিত করিয়াছেন, পানিফলের কণ্টকে কণ্টকিত করিয়াছেন, পানা দিয়া কুট-কুট করাইয়াছেন, সে কবির কলঙ্ক-ভয় ও বিচ্ছেদ-ভয় কিছু অধিক ; তাঁহাকে আমরা সত্য প্রেমিক অথবা সাধু প্রেমিক বলিয়া সম্মান দান করিতে সঙ্কুচিত হই।

"যে প্রেমেতে বিচ্ছেদ না হয়, কর মন সেই প্রেম-পদাশ্রয়।
যে প্রেমের অধিপতি, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-পতি,
সে প্রেমে হইলে রতি, হয় অনন্ত অক্ষয়॥"

যে কবি আত্ম-মনকে সম্বোধন করিয়া সমস্ত জগৎ-সংসারকে এইরূপ শিক্ষা দিয়াছেন, সেই মহামহিম নিত্য প্রেমিক কবিবরই আমাদের যথার্থ প্রেম, ভক্তি, শ্রদ্ধা, মর্য্যাদা, ও আদরের পাত্র। নবদ্বীপের গোস্বামী তত দূর উচ্চ জ্ঞানের অধিকারী হইলেন না। তিনি ভাবিয়া লইলেন, প্রেম শব্দে সাধারণ নায়ক-নায়িকার প্রেম। যাহাতে ক্ষণে ক্ষণে বিচ্ছেদ আছে, কলহ আছে, মনান্তর, ভাবান্তর, সমস্তই আছে, কপটতা যেখানে কর্ত্তরী হস্তে লইয়া প্রেমের মূলচ্ছেদ করিবার জন্য বসিয়া থাকে, মৌখিক প্রেম যেখানে নিত্য অভিনব আশ্রয় অন্বেষণ করে, সেখানে সত্য প্রেমের স্থান হয় না। তাদৃশ অস্থায়ী প্রেমকে প্রেম-পদে বরণ করিলে, প্রেমের অবমাননা করা হয়। তবে ইহার মধ্যে একটী কথা আছে। সাগরে ডুব দিলেই সকলে রত্ন সংগ্রহ করিতে পারে না; প্রেম-রত্ন লাভ করিব বলিয়া যাহারা সংসার-সাগরে ঝাঁপ দেয়, তাহাদের অধিকাংশই হতাশ হইয়া ভাসিয়া উঠে, কেহ কেহ হাবু ডুবু খায়, কেহ বা ডুবিয়া মরে। কাহার কাহার ভাগ্যে রত্নলাভ ঘটিলেও ঘটিতে পারে। গোঁসাইজী সে তত্ত্বের দিকে গেলেন না, কাজেই তাঁহাকে ঘোর অন্ধকারে ঘূর্ণায়মান হইতে হইল। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি কোলে আঁধার দেখিলেন। কোন গ্রন্থেই সার নাই সিদ্ধান্ত করিয়া বহু যত্নে সংগৃহীত গ্রন্থগুলি অযত্নে একটা ভগ্ন-সিন্ধুক-মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিবাহোদ্যোগ।

পর্য্যটনে, অধ্যয়নে, সিদ্ধান্তকরণে, এবং অপরাপর বিষয়-কার্য্যে প্রায় এক বৎসর কাটিয়া গেল। এক বৎসর অকাল বলিয়া সত্যবাদী গোস্বামী ছলনাক্রমে গৃহিণীকে প্রবোধ দিয়া রাখিয়াছিলেন, সে এক বৎসর অতীত-প্রায়। পর বৎসরের মাঘ সমাগত। কাত্যায়নীর ত্রয়োদশ বর্ষ পরিপূর্ণ। চতুর্দ্দশে পদার্পণ। সোমনাথ অষ্টাদশে। গোস্বামী-পত্নী অতিশয় ব্যস্ত হইলেন। বয়স্থা কন্যাকে অবিবাহিতা রাখিতে গোস্বামীও লজ্জিত হইতে লাগিলেন। পাত্রও গৃহে উপস্থিত, বাধা বা বিলম্বের অন্য হেতুও কিছু নাই, সুতরাং শীঘ্র শীঘ্র আয়োজন হইতে লাগিল। পাড়া প্রতিবাসী সকলেই শুনিয়া আহ্লাদিত হইলেন, কাত্যায়নীর বিবাহ। কাত্যায়নী দেখিতে পরীর মত পরম সুন্দরী ছিল না, কিন্তু স্বাভাবিক গুণে সকলেরই প্রিয়পাত্র হইয়াছিল। স্বভাব যেমন নম্র, কথাগুলিও তদ্রূপ সুমিষ্ট, লজ্জাশীলতা-মাখা। শৈশবাবধি সকলেরই বাধ্য। কাত্যায়নী ব্যতীত গোস্বামীর অন্য সন্তান সন্ততি ছিল না। তাঁহার পত্নী পূর্ব্বে ক্রমান্বয়ে তিনটী পুত্র ও দুইটী কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন। কন্যা দুটী এবং প্রথম পুত্র অকালে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। প্রবাদ ছিল, মধ্যম পুত্র বাঁচিয়া থাকিবে বলিয়া কনিষ্ঠ পুত্রকে তাঁহারা গঙ্গা সাগরে নিক্ষেপ করেন। পরে মধ্যমেরও অতি শৈশবাবস্থায় হঠাৎ মৃত্যু হয়। তাহার পর

কাত্যায়নী-ব্রত-ফলে এই কন্যাটী জন্মে, সেই জন্য ইহার নাম কাত্যায়নী। বড় আদরের কন্যা বলিয়া ইহার জননী ইহাকে আদরিণী বলিয়া আদর করেন। দেখা দেখি প্রতিবাসিনী কন্যারাও কাত্যায়নীকে আদর করিয়া আদরিণী আদুরিণী বলে। সকলের মুখেই আনন্দ-চিহ্ন। আদরিণী কাত্যায়নীর বিবাহ।

এক পক্ষের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার আয়োজন সুসম্পন্ন হইল; কেবল একটী আয়োজন বাকী। গোস্বামীর ভাবী জামাতা সোমনাথ দ্বাদশ বর্ষ বয়ক্রম কালে তাঁহাদিগের বাটীতে আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। সে আজ ছয় বৎসরের কথা। ডায়মণ্ড হারবরের নিকটবর্ত্তী করঞ্জলী গ্রামের শ্রীধর ভট্টাচার্য্য সস্ত্রীক হইয়া ঐ পুত্রটী সমভিব্যাহারে নবদ্বীপে উপস্থিত হন। তাঁহারা অত্যন্ত দরিদ্র। সেই বৎসর সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী অনেক দূর ব্যাপিয়া মহা জলপ্লাবন হয়। অনেকের ঘর বাড়ী ভাসিয়া যায়। অনাহারে অনেক লোক ভদ্রাসন ছাড়িয়া, স্থানান্তরে আসিয়া পড়ে। শ্রীধর ভট্টাচার্য্যও সেই দলের এক জন। দ্বীপচাঁদ গোস্বামী তাঁহাদিগকে দেখিয়া সদয় অন্তরে স্বীয় আলয়ে আশ্রয় দান করেন। ভট্টাচার্য্য, তাঁহার পত্নী, আর সোমনাথ প্রায় এক মাস কাল গোস্বামী-গৃহে বাস করিয়াছিলেন। অবশেষে বিদায় হইবার সময় ভট্টাচার্য্য ঐ পুত্রটীকে গোস্বামীর হস্তে অর্পণ করিয়া যান। বলিয়া যান, "দুর্ভিক্ষ ও বন্যাতে আমরা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি, পুত্রটীকে প্রতিপালন করা এক্ষণে আমাদের অসাধ্য, বাসস্থান পর্য্যন্ত ভাসিয়া গিয়াছে। আপনি দয়া করিয়া পুত্রটীকে রাখুন; যদি ইচ্ছা হয়, সুময়ে প্রত্যর্পণ করিবেন।

আমরা মধ্যে মধ্যে আসিয়া দেখিয়া যাইব। আমাদের সচ্ছল অবস্থা হইবার অগ্রে সোমনাথ যদি বিবাহের বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, এবং আপনি যদি ইহার বিবাহ দেন, সেই সময় আমরা যেন সংবাদ পাই— কে জানে, কি কারণে সোমনাথকে দেখিয়া গোস্বামী ও গোস্বামী-পত্নীর হৃদয়ে বাৎসল্য-স্নেহের আবির্ভাব হইয়াছিল। কাত্যায়নীর বয়স তখন অষ্টম বর্ষ। কাত্যায়নীর সহিত সোমনাথের বিবাহ দিবেন মনে করিয়া গোস্বামী সানন্দ চিত্তে সোমনাথকে গ্রহণ করিলেন। ভট্টাচার্য্য নিতান্ত দুরবস্থাপন্ন হইয়াছেন, দেশে ফিরিয়া যাইবার পাথেয় পর্য্যন্ত নাই, মাথা রাখিয়া থাকিবার গৃহ পর্য্যন্ত নাই; অতএব সদয় হৃদয়ে গোস্বামী তাঁহাকে পঞ্চাশটী টাকা দান করিলেন। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী বিদায় হইয়া গেলেন। অপুত্রক গোস্বামী তদবধি এই ছয় বৎসর কাল পরম যত্নে অপত্য-স্নেহে সোমনাথকে মানুষ করিতেছেন, লেখা পড়া শিখাইতেছেন। কাত্যায়নীর সহিত সোমনাথের বাল্যভাবে সবিশেষ সদ্ভাব জন্মিয়াছে। কাত্যায়নী জানিয়াছে, সোমনাথের সহিত তাহার বিবাহ হইবে, ক্রমে ক্রমে একটু একটু লজ্জার সঞ্চার হইয়া আসিতেছে। দুজনে আর অধিকক্ষণ নির্জ্জনে অবস্থান করে না।

ক্রমশই বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী। বিবাহের সময় শ্রীধর ভট্টাচার্য্যকে সম্বাদ দিতে হইবে, সেই কথাটী কন্যা-কর্ত্তার মনে পড়িল। তিনি একখানি বিনয়পূর্ণ আমন্ত্রণ-পত্র লিখিয়া এক জন ব্রাহ্মণকে করঞ্জলী গ্রামে পাঠাইয়া দিলেন। বিবাহের পাঁচ দিন থাকিতে সেই পত্রবাহক ব্রাহ্মণের সহিত শ্রীধর

ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার পত্নী নবদ্বীপে গোস্বামী-গৃহে উপস্থিত। আর এক দিন পরে বর কন্যার গাত্রে হরিদ্রা।

ভট্টাচার্য্য যে দিন উপস্থিত হইলেন, সেই দিন রজনীযোগে তাঁহার গৃহিণী ও গোস্বামী-গৃহিণী এক গৃহে শয়ন করিয়াছিলেন। অন্যান্য কথা বার্ত্তার সহিত, ভট্টাচার্য্য-পত্নী কিঞ্চিৎ স্তম্ভিতস্বরে কহিলেন, "আহা! পূর্ব্ব জন্মে তোমরা আমার কে ছিলে! আজ ছয় বৎসর আমি সোমনাথের মুখ দেখি নাই। সোমনাথ যখন আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বে ছল ছল চক্ষে আমার মুখ পানে চাহিল, তখন আমার বুক যেন ধড়্ ফড়্ করিয়া লাফাইতে লাগিল। কেন যে এমন হয়, কিছুই বুঝিতে পারি না। সোমনাথ আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে নাই, কুড়াইয়া পাইয়া মানুষ করিয়াছি মাত্র; তাহাতেই যখন এই, তখন না জানি, যাহারা গর্ভধারণ করিয়া সন্তান প্রসব করে, তাহাদের মায়া মমতা কতদূর বেশী!"

গোস্বামী-পত্নী একটু পূর্ব্বে হাসিতে হাসিতে কত কথাই কহিতেছিলেন, বিপ্র-বনিতার এই কথা শুনিয়া এককালে যেন চকিত হইয়া উঠিলেন। সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি! কি বলিলে তুমি! সোমনাথ তোমার পেটের ছেলে নয়?"

ভট্টাচার্য্য-পত্নী উত্তর করিলেন, "না ভাই, আমার অদৃষ্ট বড় মন্দ! ছেলে মেয়ে কিছুই হয় নাই। এইটীকে কুড়াইয়া পাইয়া মানুষ করিয়াছি, তাহাতেই উহার উপর পুত্র-স্নেহ জন্মিয়াছে। বিধাতা বৈমুখ কি না! দুঃখের কপাল কি না! রাখিতে পারিলাম না। অত বড় করিলাম, উপনয়ন দিলাম, শেষে পেটের দায়ে কাছ-ছাড়া করিতে হইল!"

স্থির হইয়া গোস্বামী-গৃহিণী এই কথাগুলি শুনিলেন। পূর্ব্ববৎ বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যই কি কুড়াইয়া পাইয়াছিলে? কোথায় পাইয়াছিলে?"

"ঠিক জানি না!" ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, "ঠিক জানি না! কর্ত্তার মুখে শুনিয়াছি, সমুদ্রের চড়ায়।"

গৃহে প্রদীপ জ্বলিতেছিল। গোস্বামী-গৃহিণী শয্যা হইতে উঠিয়া সেই প্রদীপের নিকট গিয়া বসিলেন। প্রদীপটী আরও একটু উজ্জ্বল করিয়া দিলেন। অলক্ষিতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ যেন শিহরিয়া উঠিল। অবিগলিত বাষ্প-বারিতে নেত্র-পুট যেন পরিপূর্ণ হইয়া আসিল। সজল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভট্টাচার্য্য-গৃহিণীর মুখের দিকে চাহিয়া রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যখন কুড়াইয়া পাইয়াছিলে, তখন তাহার বয়স কত?"

ভট্টাচার্য্য-পত্নী উত্তর করিলেন, "আড়াই বৎসর। আমরা যখন পাই, তখন অজ্ঞান। জ্ঞান হইলে মা মা বলিয়া কতই ক্রন্দন করিয়াছিল, কিছুতেই শান্ত করিতে পারি নাই। তিন চারি দিন কিছুই খাওযাইতে পারি নাই। কাঁদিয়া কাঁদিয়া যখন নিতান্ত ক্লান্ত হইত, কোলে করিয়া শয়ন করাইতাম, ঘুমাইয়া পড়িত। যতক্ষণ ঘুমাইত, ততক্ষণ ঠাণ্ডা। ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিলে কিম্বা জাগিয়া উঠিলে আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিত। সর্ব্বক্ষণ আমি তাহার মাথার কাছে বসিয়া জাগিতাম। ঘুমের ঘোরে বাছা অস্ফুট স্বরে কত কথাই বলিত, কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। থাকিতে থাকিতে ক্রমেই শান্ত হইল। বালক-স্বভাব, অল্পেই তুষ্ট, অল্পেই ভ্রান্ত। থাকিতে

থাকিতে আমাকেই মা বলিয়া জানিল। যত্নে বনের পশু পক্ষীও বশ হয়। সেই বালক স্নেহ-যত্নে আমাদেরও বশীভূত হইল। কর্ত্তা কহিয়াছিলেন, বালকটী যেখানে পড়িয়াছিল, পূর্ব্বে সেখানে সোমনাথ নামে এক শিব উঠিয়াছিলেন, সেই জন্য সেই শিবের নামেই আমরা উহার নাম রাখিয়াছি, সোমনাথ।"

ব্রাহ্মণী অনেক কথা কহিলেন। গোস্বামী পত্নীর হয় ত তত শুনিবার প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং সকল কথায় কাণও দিলেন না। দ্রুত পদে ত্রস্ত হস্তে গৃহের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া বাহিরে গমন করিলেন। তাঁহার ঈদৃশ চঞ্চল ব্যবহারে ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী কি ভাবিলেন, তিনিই জানেন। শয়ন করিয়াছিলেন, শয্যার উপরে উঠিয়া বসিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কর্ত্তা সে রাত্রে বাটীর মধ্যে শয়ন করেন নাই। ভট্টাচার্য্যের অনুরোধে বহির্ব্বাটীতেই ছিলেন। বাটীর এক জন পরিচারিকার দ্বারা গৃহিণী তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রাত্রি অধিক হয় নাই, উর্দ্ধ দেড় প্রহর মাত্র। পত্নীর আহ্বানে গোঁসাইজী অন্দর মহলে প্রবেশ করিলেন। অন্দরের যে গৃহে দামোদর শালগ্রাম শিলার অধিষ্ঠান, সেই গৃহের সম্মুখ প্রাঙ্গণে উপবেশন করিয়া গোস্বামী-দম্পতি চুপি চুপি অনেকক্ষণ কত কথা বলা বলি করিলেন; কেহই তাহা শুনিল না। শেষে একটু চিন্তাকুল অন্তরে, গম্ভীর বদনে গোস্বামী কহিলেন, "হাঁ! ভট্টাচার্য্যের মুখে আমিও কতক কতক ঐ রকম আভাস পাইলাম। কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। মনে বড় সন্দেহ হইতেছে। আর কিছু না হউক, কাত্যায়নীর বিবাহে বাধা পড়িল। পূর্ব্বে

যেরূপ পরিচয় পাইয়াছিলাম, তাহাতে আর অপর কিছু সন্ধান জানিবার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এখন জানিলাম, জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলেও সোমনাথ অজ্ঞাত-কুলশীল। জাতিতে ব্রাহ্মণ কি না, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? ভট্টাচার্য্যের গৃহে উপনয়ন হইয়াছে, শুদ্ধ এই প্রমাণে ব্রাহ্মণে তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে সাহসী হইতে পারে না। সমস্ত যত্নই বৃথা হইল!"

ব্রাহ্মণী কহিলেন, "অন্য কথা পাড়িয়া তুমি আমাকে অন্যমনস্ক করিবার চেষ্টা পাইতেছ, কিন্তু আমার প্রাণ কেমন করিতেছে। কত পূর্ব্বের কথা যে আমার মনে পড়িতেছে! তুমি গুরু, তোমাকে আর বেশী কি বলিব!"

ব্রাহ্মণী কাঁদিয়া ফেলিলেন। গোস্বামীও কাতর হইয়া তাঁহাকে নানা প্রকার প্রবোধ দিলেন। "রাত্রে আর কিছু অধিক তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না; প্রভাতে নিগূঢ় কথা বাহির হইতে পারে," এই বলিয়া পত্নীকে রাত্রের মত নিরুদ্বেগে শয়ন করিতে কহিলেন। গৃহিণী স্বামীর আজ্ঞা প্রতিপালন করিলেন, গোস্বামীও বাহিরে গেলেন। সমস্ত রজনী উভয়েরই নিদ্রা হইল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পরিচয়।

প্রভাতে নিত্যকৃত্য সমাপনান্তে গোস্বামী আর ভট্টাচার্য্য চণ্ডীমণ্ডপে নিভৃতে উপবিষ্ট হইলেন। নিকটে আর কেহই রহিল না। গোস্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, বলুন দেখি,

বালকটী যখন কুড়াইয়া পান, তখন কি তাহার কিছুমাত্র জ্ঞান ছিল না?"

ভট্টাচার্য্য কহিলেন, "কিছুমাত্র না। নিশ্বাস না থাকিলে মৃত দেহ বলিয়াই স্থির করিতে হইত।"

ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া গোস্বামী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, আপনি যে তাহার উপনয়ন দিয়াছেন, উপনয়নের অগ্রে কিরূপে জানিয়াছিলেন, সে ব্রাহ্মণ-পুত্র?"

ভট্টাচার্য্য উত্তর করিলেন, "বালকেরই মুখে। তিন বৎসরের বালক; আমি তাহাকে অনেক বার ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, নাম কি? কহিয়াছিল, টেঁপু। বাপের নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। কখন বলিয়াছিল কর্ত্তা, কখনও বলিয়াছিল গোঁসাই।"

সন্দিগ্ধভাবে গোস্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এক বার বলিয়াছিল কর্ত্তা, এক বার বলিয়াছিল গোঁসাই; ইহাতেই কি আপনি নিশ্চয় করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ-পুত্র?"

ভট্টাচার্য্য কহিলেন, "কেবল ইহাতেই না। গোঁসাই শব্দটী শুনিয়া অকস্মাৎ আমার মনে এক প্রকার সংশয় জন্মে। মানুষের ডাক-নাম গোঁসাই থাকিতে পারে। তদ্ব্যতীত সচরাচর লোকে আমাদের দেশের গোস্বামী প্রভুদিগকে সাধারণতঃ গোঁসাই বলিয়া থাকে। এই সংশয়ে আমি পুনঃপুনঃ খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তোমরা কি জাতি? তাহাতে বালক উত্তর করিয়াছিল, তাহা আমি জানি না। আবার আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার নিজের গলার পৈতা দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এই আমার যেমন পৈতা

আছে, তোমার বাপের গলায় কি এই রকম পৈতা দেখিয়াছ? বালক প্রথমে ঘাড় নাড়িয়াছিল, তাহার পর কথা কহিয়া বলিয়াছিল, হাঁ, আছে, মা আছে, বাবা আছে, পৈতা আছে, ঠাকুর আছে, গরু আছে, আর কিছু না। এই পর্য্যন্ত বলিয়া বালক উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। সে দিন আর কিছু জানিতে পারিলাম না। তাহার পর আরও অনেক দিন অনেক অবসরে কথার কৌশলে জানিতে পারিয়াছিলাম, ব্রাহ্মণের পুত্র, তাহাতে আর সন্দেহ ছিল না।"

গোস্বামীর বক্ষঃস্থল কাঁপিয়া উঠিল। সর্ব্ব শরীর হর্ষ-বিষাদে কণ্টকিত হইল। অলক্ষিতে অশ্রুমার্জ্জন করিয়া ভট্টাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বালকের গাত্রে কোন প্রকার অলঙ্কার ছিল?"

ভট্টাচার্য্য কহিলেন, "ছিল। মাথায় দুটী সোনার পুঁটে, আর গলায় একটী সোনার মাদুলী।"

গোঁসাইজী অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন। যেন কি চিন্তা করিয়া গম্ভীর বদনে গম্ভীর বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই দুখানি গহনা কি আপনি নষ্ট করিয়াছেন?"

"না।"—ভট্টাচার্য্য বিনা চিন্তায় উত্তর করিলেন, "না।—তাহা আমি নষ্ট করি নাই। সংসারে অনেক প্রকার কষ্ট হইয়াছিল, তথাপি সে দুটী বস্তু আমি পরম যত্নে রাখিয়াছি। বন্যায় ঘরদ্বার ভাসিয়া গিয়াছিল, গৃহের কোন সামগ্রীই বাহির করিতে পারি নাই, সেই সময় বড়ই মনস্তাপ পাইয়াছিলাম। যখন আমি সোমনাথকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিয়া যাই, তৎকালে সে দুটী বস্তু আমার হস্তভ্রষ্ট ছিল

তজ্জন্য আপনাকে দেখাইতে পারি নাই। মনে করিয়াছিলাম, তাহা আর পাওয়া যাইবে না। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বাটীতে প্রত্যাগত হইয়া কতকগুলি জিনিষ পত্রের সঙ্গে সে দুটী প্রিয় সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়াছি। সোমনাথের শুভ বিবাহে যৌতুক দিবার অভিলাষে এই বারে তাহা সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছি।"

গোস্বামীর হৃদয়ে কি এক অভিনব ভাবের আবির্ভাব হইল। তিনি সাগ্রহে কহিয়া উঠিলেন, "এক বার আমি তাহা দেখিতে ইচ্ছা করি। যদি বাধা না থাকে, আপনি এই সময় আমাকে দেখাইতে পারেন।"

ভট্টাচার্য্য কহিলেন, "বাধা কিছুই নাই। যখন সোমনাথকে অর্পণ করিয়াছি, তখন সোমনাথের বস্তু আপনাকে অর্পণ করিব, তাহাতে বাধাই বা কি থাকিতে পারে।"

গোঁসাইজী কহিলেন, "আমি তাহা লইতে চাহি না; সোমনাথের বস্তু সোমনাথকেই যৌতুক দিবেন। আমি কেবল এক বার দেখিব মাত্র।"

হরমণি নামে এক দাসী সেই সময় তামাক সাজিয়া দিতে আসিয়াছিল। ভট্টাচার্য্য তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ওগো বাছা! তুমি এক কর্ম্ম কর ত। বাড়ীর ভিতর আমার স্ত্রী আছেন, তাঁহার নিকট আমার একটী কৌটা আছে। সেই কৌটাটী চাহিয়া আন।"

পরিচারিকা তৎক্ষণাৎ বিপ্র-বাক্য প্রতিপালন করিল। ভট্টাচার্য্য-বনিতার নিকট হইতে একটী রক্তবর্ণ পুরাতন কৌটা চাহিয়া লইয়া চণ্ডীমণ্ডপে উপস্থিত হইল। ভট্টাচার্য্য তাহার

হস্ত হইতে কৌটাটী গ্রহণ করিয়া আবরণ উন্মোচন করিলেন। দুটী স্বর্ণ পঁহুচি, আর একটী স্বর্ণ কবচ বাহির হইল। গোঁসাইজী তাহা হাতে করিয়াই শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় অকস্মাৎ অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। ভট্টাচার্য্য তদ্দর্শনে বিস্ফারিত নয়নে চঞ্চলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি! আপনি রোদন করেন কেন? এই দুখানি গহনার মধ্যে এমন কি আছে যে, তাহাতে আপনার শোকের উদয় হইতে পারে?"

গোঁসাইজী হরমণিকে বাড়ীর ভিতর যাইবার আদেশ করিয়া সেই কবচটী খানিকক্ষণ এদিক ওদিক ধরিয়া অনিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ করিলেন। হরমণিরও চক্ষে জল। হরমণিও এক দৃষ্টে সেই অলঙ্কার দুটী দেখিতে লাগিল। পার্শ্বে মুখ ফিরাইয়া নেত্র মার্জ্জন পূর্ব্বক মৌনভাবে তথা হইতে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। গোঁসাইজী তাহা দেখিলেন, ভট্টাচার্য্য দেখিলেন না। হরমণি চলিয়া গেলে গোঁসাইজী নিস্তব্ধভাবে তথা হইতে উঠিয়া কবচটী হস্তে কার্য্যান্তর-ব্যপদেশে কিঞ্চিৎ অন্তরে গেলেন। যখন দেখিলেন, অপরের অদৃশ্য হইয়াছেন, তখন অতি সাবধানে অল্পে অল্পে মাদুলীটীর এক মুখ মুক্ত করিলেন। এক খণ্ড ক্ষুদ্র তুলট কাগজ বাহির হইল। সেখানি উন্মুক্ত করিয়া গোস্বামী ঠাকুরের সর্ব্ব শরীর প্রেম-পুলকে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সস্মিত অথচ বিস্মিত বদনে প্রত্যাগত হইয়া ভট্টাচার্য্যকে কহিলেন, "আপনি কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন, আমি আসিতেছি।"

সংক্ষেপে ত্বরিতস্বরে এই কথা বলিয়া গোস্বামী মহাশয়

অন্দর-মহলে প্রবেশ করিলেন। গৃহিণী গত রাত্রের কথায় সন্দিগ্ধভাবে নিতান্ত ম্রিয়মাণা হইয়া ভাণ্ডারগৃহে অন্যমনস্কে এখানকার জিনিষ ওখানে, ওখানকার জিনিষ সেখানে সরাইয়া রাখিতেছিলেন। প্রভু সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া হর্ষ-বিকশিত নয়নে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, "পুণ্যশীলে ! আমাদের সৌভাগ্য উদয়। হারানিধি প্রাপ্ত হইয়াছি। গণক আচার্য্যের কথা মিথ্যা হইয়াছে। সুশীলচন্দ্র বাঁচিয়া আছে ! তুমি বিরস বদন দূর করিয়া মঙ্গলাচরণ কর।"

ব্রাহ্মণী চিন্তাকুল ছিলেন, পতিবাক্য-শ্রবণে অকস্মাৎ হৃদয়ে একটা আঘাত লাগিল। যে কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাহা হইতে নয়ন ফিরাইয়া লইয়া পতির বিস্মিত বদনে চঞ্চলভাবে বিনিক্ষেপ করিলেন। মুখের ভাবে কিছুই প্রকাশ পাইল না। বোধ হইল যেন, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ঈষৎ পরে কিঞ্চিৎ সুস্থির হইয়া আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি কথা ! আমার সুশীলচন্দ্র বাঁচিয়া আছে ?—আঃ !—আঃ !— কোথায় আমার সুশীলচন্দ্র ? কোথায় আমার হারানিধি ?

"উতলা হইও না।"—গম্ভীরভাবে প্রবোধ দিয়া গোস্বামী কহিলেন, "উতলা হইও না।—তোমার সুশীল চন্দ্র তোমার গৃহেই উপস্থিত আছে। তোমার এক্ষণকার পালিত পুত্র সোমনাথই সেই প্রাণাধার সুশীলচন্দ্র। করঞ্জলীর শ্রীধর ভট্টাচার্য্য তাহাকেই সমুদ্রকূলে কুড়াইয়া পাইয়া প্রতিপালন করিয়াছিলেন; সোমনাথ নামে আমাদের সুশীলকেই আমাদের হাতে সমর্পণ করিয়াছেন। সুশীলের মাথায় যে ক্ষুটী

পুঁটে থাকিত, সুশীলের গলায় আমি যে রাম কবজ পরাইয়া দিয়াছিলাম, ভট্টাচার্য্য তাহাও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আজ আমাকে তাহা দেখাইলেন। মাদুলীর মধ্যে কবচ খানি অবিকৃত আছে। নাম, ধাম, জন্ম-নক্ষত্র, সমস্তই আমি পাঠ করিলাম। এত দিনের পর আমাদের হারানিধি আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। গণকের গণনাবাক্য মিথ্যা হইয়া গিয়াছে ”

গৃহিণীর যুগল নেত্র বারিপূর্ণ হইল। যুগল হস্তে পতির চরণ ধারণ করিয়া সাশ্রু নয়নে বসিয়া পড়িলেন, ঊর্দ্ধমুখে পতির মুখপানে চাহিয়া গদ্ গদ্ কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, “ভট্টাচার্য্যের মঙ্গল হউক, পরমেশ্বর তাঁহাদের সুখে রাখুন। আমার সুশীল, আমার সুশীল! ওঃ! এই জন্যই বাছাকে দেখিয়া অবধি আমার হৃদয়ে পুত্র-স্নেহ হইয়াছিল। এই জন্যই ভট্টাচার্য্য-পত্নীর মুখে সমুদ্র-কূলের কথা শুনিয়া গত রাত্রে আমার প্রাণ তত কাঁদিয়া উঠিয়াছিল! চল,—শীঘ্র চল, আমার মনে আর একটী কথা উদয় হইতেছে, শীঘ্র চল, সুশীলকে ডাকাইয়া সে সন্দেহটীও ভঞ্জন করিয়া লইব। এখনই তাহাকে ডাকাইয়া পরীক্ষা করিতে হইবে।”

গোস্বামী কহিলেন, “আর কোন পরীক্ষার প্রয়োজন নাই, আর কোন সন্দেহ রাখিবার কারণ নাই। এই দেখ, সেই স্বর্ণকবচ। ইহাই আমাদের সুশীল চন্দ্রের গলায় থাকিত।” এই কথা বলিয়া কবচ মাদুলীটী বাহির করিয়া গৃহিণীকে দেখাইলেন। স্থির দৃষ্টিতে তাহা দর্শন করিয়া পুত্র-বৎসলা গোস্বামী-মহিলার চক্ষে আবার জলধারা গড়াইল। আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে তিনি পুনরায় পতিকে সম্বোধনপূর্ব্বক

কহিলেন, "তথাপি,—তথাপি প্রভু! সে বিষয়টী আমাকে পরীক্ষা করিতে হইবে। তুমি চল,—সেটী ভাল করিয়া না দেখিলে,—আমরা স্ত্রীজাতি কি না,—সেটী ভাল করিয়া না দেখিলে সন্দেহ ঘুচিতেছে না।"

গোস্বামী আর আপত্তি করিলেন না। উভয়ে ভাণ্ডার গৃহ হইতে বাহির হইলেন। শয়ন-কক্ষের সংলগ্ন আর একটী গৃহে প্রবেশ করিয়া হরমণির দ্বারা সোমনাথকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বিষণ্ণবদন সোমনাথ উপস্থিত হইলে, গোস্বামী-পত্নী সর্ব্বাগ্রে সস্নেহ নয়নে তাহার পৃষ্ঠভাগ নিরীক্ষণ করিলেন। সুশীলচন্দ্রের পৃষ্ঠের বাম পার্শ্বে একটী অর্দ্ধচন্দ্রাকার পাংশুবর্ণ জড়ুল ছিল। বয়সের সহিত তাহা আরও কিছু উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করিয়াছে। জননী তাহা দর্শন করিয়া স্তম্ভিত, বিস্মিত, ও স্নেহভাবে পরিপূর্ণ হইলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় পুনঃপুনঃ অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। জননী সস্নেহে পুত্রকে পার্শ্বদেশে বসাইয়া চিবুক স্পর্শ পূর্ব্বক সাদরে চুম্বন করিলেন। কহিলেন, "বাছা! বাছা সুশীল! তুমি আমারই সুশীলচন্দ্র। এই অভাগিনীর গর্ভেই তোমার জন্ম হইয়াছে। তুমি ভট্টাচার্য্যের পুত্র নও, ভট্টাচার্য্যের স্ত্রী তোমার জননী নহেন; তুমি আমাদেরই প্রাণধন সর্ব্বস্ব। ভট্টাচার্য্য তোমার প্রতিপালক মাত্র। তোমার নামও সোমনাথ নয়, তুমি আমাদেরই সুশীলচন্দ্র। আমি রাক্ষসী, তিন বৎসর বয়সের সময় আমি তোমাকে গঙ্গাসাগরে হারাইয়াছিলাম। শ্রীধর ভট্টাচার্য্য তোমাকে সমুদ্রের চড়ায় কুড়াইয়া পাইয়া পুত্রভাবে প্রতি-পালন করিয়াছিলেন। ভাগ্যক্রমে তিনি তোমাকে আমাদের

হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার নিকটে আমরা জীবনের জন্য ক্রীত হইয়া রহিলাম। যিনি তোমাকে মাতার ন্যায় স্নেহ যত্নে প্রতিপালন করিয়াছেন,সেই দ্বিজপত্নীর নিকটেও আমি চির-ঋণী থাকিলাম। ছয় বৎসরকাল তুমি অজ্ঞাতরূপে অপরিচিত নামে আমাদের গৃহে রহিয়াছ,আমরা চিনিতে পারি নাই ; এখন সমস্তই প্রকাশ পাইয়াছে।” সস্নেহে এই কথা বলিয়া স্নেহময়ী জননী পুনরায় প্রাণাধিক সুশীলচন্দ্রের চিবুক স্পর্শে চুম্বন করিলেন।

সুশীলচন্দ্র এতক্ষণ বিস্ময়-স্তম্ভিত অন্তরে নির্ব্বাক হইয়া ঐ সকল কথা শ্রবণ করিতেছিল, জননীর কথা সমাপ্ত হইলে ভক্তিভাবে ভূমিষ্ঠ হইয়া জনক জননীর চরণে প্রণিপাত করিল। কিন্তু তৎকালে তাহার মানস-সরোবরে যে কি এক হৃদয়-বিকম্পন ঘূর্ণাবায়ু উত্থিত হইয়া প্রবল তরঙ্গ তুলিয়াছিল, তাহা সেই তরুণ হৃদয়ই অনুভব করিতে পারিল, অপরের পক্ষে অননুভবনীয়। সুশীলচন্দ্র অবনত মস্তকে জননীর বাম পার্শ্বে বসিয়া রহিল। একটু পরে শ্রীধর ভট্টাচার্য্য, তাঁহার পত্নী হরমণি দাসী, বালিকা কাত্যায়নী, আরও দুই এক জন পরি-চারিকা, ও প্রতিবাসিনী সেই স্থানে উপস্থিত। ঘটনা-শ্রবণে সকলেই বিস্ময়-পুলকে পরিপূর্ণ। হরমণি শিশুকালে সুশীল চন্দ্রের ধাত্রী ছিল, সুশীলের প্রতি তাহার মাতৃবৎ স্নেহ। চণ্ডীমণ্ডপে কৌটামধ্যস্থ কবচ দর্শনে হরমণির চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়াছিল, তাহারও কারণ এই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

গণকের গণনা।

এক্ষণে কিছু পূর্ব্ব কথা প্রকাশ করিবার অবসর। গোস্বামী ঠাকুর বারম্বার বলিয়াছেন, গণকাচার্য্যের গণনা-বাক্য মিথ্যা হইয়াছে। একথার নিগূঢ় তাৎপর্য্য কি? গণকাচার্য্য কাহার সম্বন্ধে কি কথা গণনা করিয়াছিলেন?—কি কথা মিথ্যা হইয়া গেল?

সুশীলচন্দ্রের অন্নপ্রাশনের সময় এক জন গণক আসিয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের অনুরোধে তিনি ঐ বালকের ভাগ্য গণনা করিয়া প্রথমে মুখখানি কাঁচু মাচু করেন। তাহার পর গোস্বামী মহাশয়ের অত্যন্ত আগ্রহে দুঃখিত-চিত্তে বলিয়াছিলেন, "আপনি জন্মদাতা পিতা, আর ইনি গর্ভধারিণী জননী; আপনাদের মুখের উপর সে নির্ঘাত-বাক্য বলিতে সঙ্কোচ করি। বালকটীর জলে ফাঁড়া আছে। সমুদ্রে ডুবিবার আশঙ্কা।"

গণকের বাক্যে গোস্বামী অত্যন্ত কাতর হইলেন। তাঁহার পত্নী নিতান্ত অধীরা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তিনি গণকের নিকট করজোড়ে মিনতিপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "ঠাকুর! এ সর্ব্বনাশ নিবারণের কি কোন উপায় হইতে পারে না? আমি বড় মন্দভাগিনী; সন্তান হইয়া রক্ষা পায় না; আবার এছেলেটীরও এত বড় ফাঁড়া। আমার বুক যেন ফাটিয়া যাইতেছে। যদি কিছু উপায় থাকে, দয়া করিয়া বল, পরমেশ্বর তোমার ভাল করিবেন।"

গোস্বামী নিজেও কাকুতি মিনতি করিয়া গণক ঠাকুরকে বিস্তর উপরোধ করিলেন। গণক ঠাকুর উত্তম সুযোগ পাইলেন। ধ্যান-মগ্নের ন্যায় কিয়ৎক্ষণ মুদিত-নেত্রে কি চিন্তা করিয়া আরেক দুই বার আকাশ পানে চাহিলেন; এক বার ভূমিতল নিরীক্ষণ করিলেন;—দুই বার উভয় পার্শ্বে বক্র দৃষ্টি করিলেন;—বক্ষঃস্থলে যজ্ঞোপবীতসহ মুষ্টিবদ্ধ করিয়া কি যেন জপ করিলেন; অল্প অল্প ওষ্ঠ কম্পিত হইল; ভূতলে পাঁচ বার পদাঘাত করিলেন;—অবশেষে মাতৃক্রোড়স্থ শিশুর শিরোপরি উপবীত ধারণ করিয়া কি কতকগুলি মন্ত্র পাঠ করিলেন। আবার ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "দৈব বলে কি না হয়।—গ্রহফাঁড়া শুনিলেই হাল ছাড়িয়া দিতে হয় না।—তত চিন্তা নাই। বেশী কিছুই করিতে হইবে না; একখানি রামকবচ ধারণ করাইলেই মঙ্গল হইবে। আমি নিজেই সাত দিন পরে আসিয়া রামকবচ দিয়া যাইব। সর্ব্ব কবচ অপেক্ষা রামকবচ উৎকৃষ্ট রক্ষাকবচ। ব্যয়ও সামান্য। পাঁচটী রজত মুদ্রা মাত্র।—টাকাকটী কিন্তু অগ্রে চাই; কারণ কি না, কবচ লিখিবার খরচপত্র আছে।"

তথাস্তু।—গোস্বামী-পত্নী অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া উৎসাহের স্বরে কহিলেন, "টাকার জন্য চিন্তা নাই; এখুনি আমি তোমাকে পাঁচ টাকা দিতেছি, ছেলেটী যাহাতে রক্ষা পায়, তাহা তোমাকে করিতেই হইবে। টাকার জন্য চিন্তা নাই; ছেলে আগে না টাকা আগে।—পাঁচ টাকার জায়গায় বেশী লাগে, তাহাও দিব।—ছেলেটীকে রক্ষা কর।"

গোস্বামীও গৃহিণী-বাক্যে অনুমোদন করিলেন। তৎক্ষণাৎ

গণকের হস্তে পাঁচটী টাকা আনিয়া দেওয়া হইল। বালককে আশীর্ব্বাদ করিয়া গণক ঠাকুর মনে মনে ভাবিলেন, "আরও কিছু বেশী চাহিলেই ভাল হইত! আচ্ছা,—সূত্রপাত করা থাকিল, যে দিন কবচ লইয়া আসিব, কবচের অভিষেক বলিয়া সেই দিন দশ টাকা বেশী করিয়া লইব।"

নামাবলী স্কন্ধে করিয়া গণক ঠাকুর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বদনের চিন্তাকুল ভাব দেখিয়া গোস্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর! বিষণ্ণ কেন?—কি ভাবিতেছেন?"

ভাব গোপন করিয়া গণক ঠাকুর উত্তর করিলেন, "ভাবি নাই কিছু; বোধ হয় তিন চারি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ছেলেটীর সর্ব্বদা ব্যামো স্যামো হইবে। রক্ষা কবচে সচরাচর আধিব্যাধির দমন হয় না। যদি দেখেন, ছেলেটী রুগ্ন হইয়া পড়ে, তাহা হইলে কিঞ্চিৎ সুস্থ অবস্থায় এক বার মকরে গঙ্গাসাগরে স্নান করাইয়া আনিবেন। তাহাতে সমুদ্র-ফাঁড়ারও ভয় ঘুচিয়া যাইবে।"

বিমর্ষ বদনে গোঁসাইজী সে বাক্যেও অঙ্গীকার করিলেন। গৃহিণীও তাহাতে সায় দিয়া গণককে সম্বোধনপূর্ব্বক আবার কহিলেন, "দেখো ঠাকুর! সাত দিনের দিন কবচখানি যেন পাওয়া যায়।"

একটী সুদীর্ঘ হাই তুলিয়া অনুকূল উত্তর প্রদানপূর্ব্বক গণক ঠাকুর সে দিন বিদায় হন। তাহার পর নির্দ্দিষ্ট দিবসে কবচখানি দিয়া অভিষেক বাবতে পঁচিশ টাকা আর গণনার দক্ষিণা দশ টাকা, একুনে এই পঁইত্রিশ টাকা লইয়া যান। সেটী আজ অষ্টাদশ বৎসরের কথা। তদবধি দীপচাঁদ গোস্বামীর ভবনে সেই গণকের আর একবারও পদার্পণ হয় নাই।

গণক যাহা অনুমানে বলিয়াছিলেন, তাহাও সত্য হইয়াছিল। সুশীলচন্দ্র আড়াই বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নানা রোগে আক্রান্ত হয়। তাহার পরেও মধ্যে মধ্যে মাথা ধরা, পেট ফাঁপা, অজীর্ণ, মন্দাগ্নি, উদরাময় ইত্যাদি হইত; রামকবচে তাহার উপশম করিতে পারিত না। কাজেই গোঁসাইজী এক দিন গণকবাক্য স্মরণ করিয়া সুশীলের তৃতীয় বর্ষের পৌষ মাসের শেষে তাহাকে লইয়া সপত্নীক গঙ্গাসাগরে যাত্রা করেন। মকর সংক্রান্তির দিন সেই তিন বৎসরের শিশুকে নৌকার উপর হইতে সাগরে স্নান করান হইতেছিল; জলনিধির তরঙ্গবেগে সহসা দৈববশে জননীর হস্ত হইতে পিছলাইয়া জলে পড়ে। জনক জননী মহা শোকাকুল। তরঙ্গে তরঙ্গে বালকটী যে কোথায় কত দূরে ভাসিয়া যায়, কেহই কিছু সন্ধান করিতে পারেন নাই। তাহার পর যাহা ঘটিয়াছে, পাঠক মহাশয় পূর্ব্বেই তাহা অবগত হইয়াছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পরস্পর বিদায়।

পূর্ব্ব কথা স্মরণে মূল প্রস্তাব হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়া গেল। পাঠক মহাশয় এক্ষণে সেই আরব্ধ বিষয়ের শেষাংশ দর্শন করুন।

হারাপুত্র প্রাপ্ত হইয়া সস্ত্রীক গোস্বামী মহাশয় যে পরম পুলকিত হইলেন, একথা বলা বাহুল্য। ধাত্রী হরমণির

অন্তরেও পরমানন্দ। সুশীলচন্দ্র ও কাত্যায়নীর মনের ভাব অন্য প্রকার। ভ্রাতা ভগিনী পরিচয় হইল, অথচ তাহাদের মনে আনন্দ নাই। সুশীল যখন সমুদ্রে হারাইয়া যায়, তখন কাত্যায়নীর জন্ম হয় নাই। তাহার পর করঞ্জলীর ভট্টাচার্য্য যে সময় দ্বাদশ বর্ষীয় সুশীলকে অজ্ঞাত সোমনাথ নামে পরিচয় দিয়া পিতৃগৃহে রাখিয়া যান, তখন কাত্যায়নী আট বছরের। এখন সুশীলচন্দ্র অষ্টাদশে, কাত্যায়নী চতুর্দ্দশে। এই ছয় বৎসর সুশীলও জানিত না যে কাত্যায়নী তাহার সহোদরা, কাত্যায়নীও জানিত না যে সুশীল তাহার সহোদর। বর্ষ-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরে কেবল এই মাত্র জানিয়াছিল যে, তাহাদের উভয়ে বিবাহ হইবে। একত্র ক্রীড়া, একত্র উপবেশন, একত্র ভোজন, একত্র ভ্রমণ, ইত্যাদি আসঙ্গক্রমে উভয়ে বিলক্ষণ ভাব হইয়াছিল। অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবা ও চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকার হৃদয়ে যথার্থ প্রণয় সঞ্চার না হইলেও বিবাহের নামে অবশ্যই আনন্দ হইয়া থাকে। সুশীল ও কাত্যায়নীর হৃদয়ে অবশ্যই সে আনন্দের উদয় হইয়াছিল। এক্ষণে সত্য পরিচয় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আশাভঙ্গ জন্য নিরানন্দ প্রবেশ করিল। প্রকৃতিসিদ্ধ ভ্রাতৃ-ভগিনী-স্নেহ-জনিত আনন্দ যেন জলদাবৃত শশধরের মত লুক্কায়িত থাকিয়া; স্ফূর্ত্তি পাইল না। উভয়েই ভিন্ন ভিন্ন গৃহে বিমর্ষ।

কাত্যায়নীর বিবাহে বিলম্ব পড়িয়া গেল। আগামী কল্য গাত্রে হরিদ্রা হইবার কথা, কিন্তু তত শীঘ্র পাত্র পাওয়া যায় কোথায়; সুতরাং সে দিনটীও ত্যাগ করা হইল।

পাঁচ সাত দিন অতীত। সুশীল ও কাত্যায়নী উভয়েই

দিন দিন অধিক চিন্তাযুক্ত, অধিক বিষণ্ণ। বিবাহে নিমন্ত্রণে আসিয়াছিলেন, বিবাহের ত বিচিত্র সংঘটন,—ভট্টাচার্য্য মহাশয় আর অধিক দিন নবদ্বীপে বিলম্ব করিতে পারিলেন না। এক দিন প্রাতঃকালে অবসর বুঝিয়া গোস্বামী মহাশয়কে কহিলেন, "দেখুন, পরমেশ্বরের মনে ছিল, আপনার হারা-পুত্র আপনি প্রাপ্ত হইলেন ;—আশীর্ব্বাদ করি, পুত্র কন্যা দীর্ঘজীবী হইয়া সুখে থাকুক। আমি অনেক দিন হইল, গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছি ; ঘর সংসার ফেলিয়া আর কত দিন এখানে থাকিতে পারি? অনুমতি করুন, বিদায় হই। সুশীলের বিবাহের সময় সংবাদ প্রেরণ করিলেই পুনরায় আসিব। কাত্যায়নীর বিবাহেও যেন সমাচার পাই।"

গোঁসাইজী কহিলেন, "আপনার কাছে আমি চির জীবনের মত বাধ্য হইয়া রহিলাম। আপনার অনুগ্রহেই আমি আমার হারানিধি প্রাণাধিক সুশীলচন্দ্রকে প্রাপ্ত হইলাম। এজন্মে তাহাকে আর দেখিতে পাইব, ইহা আর মনে ছিল না ; কেবল জগদীশ্বরের কৃপায় আপনার দ্বারাই আমাদের এই সৌভাগ্যের উদয় হইল। আপনি গৃহে যাইবেন, বারণ করিতে পারি না। আশা করি, সময়ে সময়ে সাক্ষাৎ লাভ করিয়া সুখী হইব।"

ভট্টাচার্য্যকে এই কথা বলিয়া গোঁসাইজী এক বার অন্তঃপুর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অর্দ্ধদণ্ড পরে প্রত্যাগত হইয়া ভট্টাচার্য্যের হস্তে দুই শত মুদ্রা প্রদান করিয়া বিনম্র-বদনে কহিলেন, "মহাশয়! আপনার পাথেয়স্বরূপ এই যৎকিঞ্চিৎ অর্থ অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ করুন। আপনি আমার যে উপকার

করিয়াছেন, তাহার উপযুক্ত প্রতিশোধ কিছুই দিতে পারিলাম না, এই বড় আক্ষেপ রহিল।"

সানন্দ অন্তরে গোস্বামীদত্ত অর্থ গ্রহণ করিয়া ভট্টাচার্য্য কহিলেন, "অকিঞ্চিৎকর অর্থে অকৃত্রিম মিত্রতার পরিচয় হয় না, উহা কোন প্রকারে বিনিময়েরও বস্তু নহে। আপনার সদ্ব্যবহারেই আমি পরম আপ্যায়িত হইয়াছি। সুযোগ পাইলেই এই তীর্থস্থানে আসিয়া আপনার দর্শন লাভ করিব।"

এইরূপ সৌহার্দ্দ-বর্দ্ধন নানাপ্রকার কথোপকথনের পর উভয়ে স্নান আহ্নিক সমাপন করিলেন। যথাসময়ে আহারাদি সমাপ্ত হইল। আহারান্তে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহযাত্রা। তিনি সস্ত্রীক প্রফুল্ল-বদনে গৃহস্থ প্রত্যেকের নিকট সস্নেহ প্রিয়-সম্ভাষণে বিদায় গ্রহণ করিয়া ভাগীরথীর ঘাটে তরণী আরোহণ করিলেন। গোঁসাইজী স্বয়ং সুশীলের সহিত তাঁহাদের অনুবর্ত্তন করিয়া তাঁহাদিগকে নৌকায় তুলিয়া দিয়া কত কি চিন্তা করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

এক মাস অতীত হইয়া গেল। সুশীল ও কাত্যায়নী ক্রমশই কৃশ, ক্রমশই বিবর্ণ, ক্রমশই উৎসাহ-পরিশূন্য। ছয় বৎসর যাহারা একত্র খেলা করিয়াছে, একত্র ভ্রমণ করিয়াছে, একত্র বসিয়া গল্প করিয়াছে, একত্র পুস্তক পাঠ করিয়াছে, দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে একত্র বসিয়া ভোজন করিয়াছে, এখন আর তাহারা প্রায়ই একত্র হয় না। যদি দৈবাৎ নির্জ্জনে দেখা হয়, উভয়েই মাথা হেঁট করিয়া থাকে ;—উভয়ের চক্ষেই অশ্রু দেখা দেয়, উভয়েই মুখ ফিরাইয়া ভিন্ন ভিন্ন দিকে চলিয়া যায়। অপরে সে ভাব অনুভব করিতে পারে না ; বোধ হয় লক্ষ্যও হয় না।

কাত্যায়নী বয়স্থা হইয়াছে; বিবাহ না দিয়া গোস্বামী মহাশয় আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। সুশীলচন্দ্রেরও বিবাহের বয়স হইয়াছে, তাহার জন্যও একটী পাত্রী অন্বেষণ করা আবশ্যক। গোঁসাইজী ব্যস্ত হইয়া স্থানে স্থানে পাত্র পাত্রী অন্বেষণে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। আরও এক মাস অতীত। শান্তিপুরে একটী সুপাত্র, আর গুপ্তিপাড়ায় একটী সুপাত্রী স্থির হইল। অচিরেই শুভকর্ম্ম সমাধা করা গোস্বামী প্রভুর ইচ্ছা। কিন্তু প্রকৃত আয়োজনের এখন অনেক বাকী। পূর্ব্বে এক হারা আয়োজন করা হইয়াছিল, ঘটনাচক্রে এখন দোহারা দ্রব্যাদির প্রয়োজন। কাত্যায়নীর অলঙ্কার বস্ত্র প্রস্তুত, আবার নূতন বধূর জন্য আর এক প্রস্ত আবশ্যক। সুশীলের বস্ত্রাদি বরসজ্জা প্রস্তুত, আবার জামাতার নিমিত্ত নূতন সজ্জা প্রয়োজন। কাজেই কিছু বিলম্ব।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সাংঘাতিক আলাপ।

দেখিতে দেখিতে আরও এক মাস যায়। বাণীকান্ত ঘোষ নামে এক ব্যক্তি সুশীলকে ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষা দিতেন। পাড়ার আরও পাঁচ সাতটী ছাত্র তাঁহার কাছে তখনকার দস্তুর মত "গাড ঈশ্বর, লাড খোদা, হার্ষো ঘোড়া, কৌ গাভী" ইত্যাদি ইংরাজী পাঠ লইত। নবদ্বীপে তখন বাণীকান্তের ন্যায় ইংরাজীওয়ালা কেহই ছিলেন না; এই সুপারিষে পাড়ায়

তিনি "বাপু ম্যাষ্টার" নামে বিখ্যাত। কেহ কেহ বা বেশী কথা এড়াইবার জন্য শুদ্ধ "ম্যাষ্টার" বলিয়া ডাকিত। শিষ্যদের নিকট মান্য উপাধি "স্যার।" এক দিন বৈকালে সুশীলচন্দ্র একাকী তাহার বাপু ম্যাষ্টারের সঙ্গে তাহাদের মেজো বাগানে* বেড়াইতে যায়। কথায় কথায় ম্যাষ্টার মহাশয় তাহার নিকট সতীদাহ ও গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপের গল্প করেন। সুশীলচন্দ্র সংক্ষেপে তাহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া সবিস্ময়ে ম্যাষ্টারের মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "স্যার! সতীদাহ কারে বলে?—গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ করাই বা কি রকম?"

বাপু ম্যাষ্টার স্থূল সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা করিয়া সুশীলকে ঐ দুটী বিষয়ের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মুখখানি বর্ষাকালের জোয়ার-ভাটা-বিহীন নদীর জলের ন্যায় গম্ভীর হইয়া আসিল। এক দৃষ্টে সুশীলের বিষণ্ণ বদন নিরীক্ষণ করিয়া অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিলেন। অবশেষে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে স্তম্ভিত স্বরে কহিলেন, "দেখ সুশীল! তোমার পিতামাতা তোমাকে সমুদ্রে হারাইয়াছিলেন, আট নয় বৎসর পরে আশ্চর্য্য প্রকারে অপর এক জন ব্রাহ্মণের নিকট তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। সে ব্রাহ্মণও তোমাকে সমুদ্রের চড়ায় অজ্ঞানাবস্থায় কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন

---

* নবদ্বীপে দ্বীপচাঁদ গোস্বামীর আম কাঁটালের বাগান ছিল। বিশেষ জানাইবার জন্য বড় বাগান, মেজো বাগান, ও ছোট বাগান বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইত। বড় বাগান আর ছোট বাগান জঙ্গলাকীর্ণ অপরিষ্কার; মেজোটী কিছু পরিষ্কার, মাঝে মাঝে দুই একটী চাঁপা, বকুল, ও করবী ফুলের গাছ ছিল; বেড়াইবার অযোগ্য ছিল না।

বলিয়াছেন। বড়ই আশ্চর্য্য! বলিতে কি সুশীল! সেই বিষয়ে আমার মনে বড় একটা ধোঁকা জন্মিয়া রহিয়াছে। আমি—"

"কি ধোঁকা স্যার?" —কথা সমাপ্ত হইবার অগ্রেই অধিকতর বিষাদ-বিস্ময়ে সুশীলচন্দ্র সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করিল, "কি ধোঁকা স্যার?"

স্যার তখন উভয় তরঙ্গের মাঝা মাঝি পড়িলেন। ভাবিতে লাগিলেন,—"বলি কি না বলি?—যে কথা ঠিক জানি না, বালকের নিকটে সে কথা প্রকাশ করিয়া কলঙ্কগ্রস্ত হইব;—বিপদগ্রস্তও হইতে পারি। করি কি?—রসনা দমনে অসমর্থ হইয়া হঠাৎ ধোঁকার কথাটা কেনই বা বলিলাম! এখন করি কি?"

বিষম ভাবনা!—স্যার তখন সত্য সত্যই উভয় সঙ্কটে পড়িলেন! সুশীলের পুনঃপুনঃ সাগ্রহ উত্তেজনায় বুদ্ধির সাগর বাপু ম্যাষ্টার অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিলেন, "ধোঁকাটা কি জান সুশীল!—এদেশে রীতি আছে, প্রসূতির প্রথম প্রথম দুটী একটী সন্তান নষ্ট হইলে, শেষের সন্তান বাঁচিয়া থাকিবে বলিয়া, মাঝের একটী সন্তানকে গঙ্গাসাগরকে মানৎ করে।"

এই পর্য্যন্ত শ্রবণ করিয়া সুশীলচন্দ্র একটু গম্ভীরভাবে কহিল, "যদি দেশের রীতিই ঐ প্রকার, তবে সে কথা স্মরণ করিয়া আপনার ধোঁকা জন্মিয়া রহিয়াছে কেন?"

ম্যাষ্টার মহাশয় আর মনের কথা গোপনে রাখিতে পারিলেন না। মাষ্টারি ধরণে মুখভঙ্গী করিয়া অঙ্গ সঞ্চালন পূর্ব্বক কহিলেন, "কেন জন্মিয়া রহিয়াছে জান সুশীল! তোমার

দুটী সহোদরের জন্ম হইয়াছিল;—অকালে অতি অল্প বয়সেই সে দুটীর মৃত্যু হয়। সেই জন্য বোধ করি, তোমার পিতা মাতা হয় ত তোমাকে গঙ্গাসাগরকে মানৎ করিয়া থাকিবেন। আমার অনেক বয়স হইয়াছে কিনা, আমি সব জানি। তোমার পিতা দীপচাঁদ গোস্বামী প্রতি বৎসর মকর সংক্রান্তির সময় সাগরযাত্রা করেন। এক বৎসর তোমাকে আর তোমার জননীকে সঙ্গে লইয়া যান। তখন তুমি খুব ছোট। তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন, তোমাকে আনিলেন না। সকলের সাক্ষাতে বলিলেন, তুমি সাগরে হারাইয়া গিয়াছ! যাহাই কেন হউক না, সন্তান হারাইয়া গেলে মাতা পিতা কখনও পাষাণের মত স্থির থাকিতে পারেন না। কিন্তু আমার বেশ স্মরণ হয়, সে সময় ঐ কথা প্রকাশ করিয়া তাঁহারা বেশ পাষাণের মত স্থির ছিলেন। কেন জান?—প্রথা আছে, সাগরকে সন্তান দান করিয়া কাঁদিতে নাই।—কাঁদিলে মানতি ব্রতের ফল হয় না। ভবিষ্যৎ পুত্রের কল্যাণ কামনায় তাঁহারাই তোমাকে সমুদ্রের জলে বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছিলেন। পরমায়ু ছিল, ঈশ্বরেচ্ছায় চড়ায় ঠেকিয়া তুমি রক্ষা পাইয়াছিলে। শেষে ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ যেন ঈশ্বরের দূতস্বরূপ হইয়া তোমাকে প্রতিপালন করেন। এক জনের পুত্রকে অপরে মানুষ করে, এমন প্রমাণ আমাদের পুরাণ শাস্ত্রে অনেক আছে।”

সুশীলচন্দ্রের সর্ব্ব শরীর শিহরিয়া উঠিল। আর একটীও কথা কহিল না। বেলাও অবসান হইল, আকাশের পশ্চিম কোণে এক খণ্ড ঘোর অন্ধকার কৃষ্ণবর্ণ মেঘ দেখা দিল। মেঘ গর্জ্জনে বাপু মাষ্টারের অত্যন্ত ভয় হয়। গুড় গুড়

করিয়া মেঘ ডাকিয়া উঠিল। বাণু মাষ্টারের দৌড়!—পশ্চাৎ পশ্চাৎ সুশীলচন্দ্রও ছুটিতে লাগিল। সন্ধ্যার সঙ্গে ঝড় বৃষ্টি আসিল। বাণু মাষ্টারের আর খোঁজ খবর রহিল না; সুশীলচন্দ্র অৰ্দ্ধ সিক্ত বসনে গৃহে আসিয়া পৌঁছিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

গণকের গণনা সফল।

আজ রাত্রে সুশীলচন্দ্রের বিষণ্ণ বদন আরও বিষণ্ণ। সুশীল ভাবিতেছে, "উঃ কি শুনিলাম! পিতা মাতা—আমাকে সমুদ্রে ভাসাইয়া দিয়া আসিয়াছিলেন; তাঁহারা কি এতই নিষ্ঠুর! জগতে কি জনক জননী এত নিষ্ঠুর থাকিতে পারে। সত্য কি আমি সেই নিষ্ঠুর পিতার ঔরসে নিষ্ঠুরা জননীর জঠরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম। কাত্যায়নি! সত্য কি তুমি সেই দয়া-মায়া-শূন্য জনক-জননীর কন্যা। না, না, তাহাও কখনই সম্ভব বোধ হয় না। তাহা হইলে তুমি আমাকে তত ভাল বাসিতে পারিবে কেন। তাহা হইলে তোমার হৃদয়ে তত স্নেহ, তত দয়া, তত মায়া স্থান পাইবে কেন? তুমি স্বর্গ-কন্যা। পৃথিবীর লোকের মুখে এখন তুমি আমার সহোদরা। এখন সহোদর-স্নেহে আমি তোমাকে স্পর্শ করিতে পারি, আশীর্ব্বাদ করিতে পারি, ভাল বাসিতেও পারি। কিন্তু সে স্নেহ, সে ভালবাসা আর এক প্রকারের। কাত্যায়নি কোথায় তুমি, এক বার দেখ এসে কি দশা এখন আমার। না এস না, দেখ না, তোমার সে স্নেহমাখা মুখ আর আমি দেখিতে পারিব না।

আমি আর গৃহে থাকিব না, রজনী প্রভাতে আর তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। কাত্যায়নি আমি তোমাকে ভুলিব না। নিষ্ঠুর জনক-জননীর সঙ্গে আর সম্বন্ধ রহিল না। যাঁহার ক্রোড়ে পিতা মাতা সঁপিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারই অনন্ত-ক্রোড়ে গিয়া শীতল হইব। তখন জ্ঞান ছিল না, এখন জ্ঞান হইয়াছে; এখন আর বালির চড়ায় ঠেকিব না। পিতা এক দিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, মানুষ মরিলে কি হয়। তখন উত্তর দিতে পারি নাই। এইবারে বোধ হয়, পারিব। কাত্যায়নি এক বার আসিয়া দেখা দাও। আঃ একি ভ্রান্তি, আবার কেন ডাকি, সে মুখ দেখিলে আবার হয়ত মায়া আসিবে। যে শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়াছিলাম আবার কি সেই শৃঙ্খল পায়ে দিব? না কাত্যায়নি, তাহা আর হইবে না। তুমি আর চক্ষের কাছে এস না, আর না। একি হরমণি, তুমি কেন এখানে?"

সুশীলচন্দ্র শয়ন করিয়াছিলেন; মুক্ত বাতায়ন-পথে চঞ্চল পবন আসিয়া তাঁহার সিক্ত বসন অল্পে অল্পে শুষ্ক করিতেছিল। সুশীল চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন, ভ্রম নয়, স্বপ্ন নয়, সত্যই সম্মুখে হরমণি।

হরমণি সুশীলচন্দ্রের শৈশব-ধাত্রী। এ পরিচয় পাঠক মহাশয় পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। অশ্রুপূর্ণ-নয়নে সস্নেহ বচনে কহিল, "সুশীল বাছা, এই মেঘ, এই অন্ধকার, এই দুর্য্যোগ, এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে? কখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, সন্ধ্যার পরেই তোমার ক্ষুধা পায়, এখনও কিছু খাও নাই, আমার প্রাণ ছট্‌ফট্ করিতেছে; এস যাদু ঘরে এস।"

উদাস-নয়নে সাত্রীর মুখ পানে চাহিয়া সুশীলচন্দ্র কহিলেন, "না আর আমি কিছু খাইব না। আমার খাওয়া দাওয়া ফুরাইয়াছে, সংসারে আমার খেলা ধুলা ফুরাইয়াছে, সুশীল কিম্বা সোমনাথ নামে তোমাদের স্নেহপাত্র জগতে কেহ ছিল, ইহা তোমরা আর মনে করিও না, আমি সাগরের সামগ্রী। সাগরে আমার বিসর্জ্জন হইয়াছিল। শিশু বলিয়া সাগর আমাকে গ্রহণ করেন নাই, এখন গ্রহণ করিবেন; আমি সাগরে যাইব। এই নবদ্বীপ চৈতন্য দেবের জন্মস্থান। সেই মহাপ্রভু চৈতন্য দেব আজ আমাকে চৈতন্য দান করিয়াছেন। হরিপ্রেমে সেই নিমাই সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, শচীদেবীর মায়া রাখেন নাই, প্রাণ-প্রতিমা, পতিব্রতা বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রণয়ের অনুরোধ রাখেন নাই, পরমেশ-প্রেমে বিভোর হইয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিলেন। সেই প্রেমে আবার নিমাই পুরুষোত্তম তীর্থে কৃষ্ণ দর্শন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে ধরিতে গিয়া ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। দেখিতেছি সেই নিত্য চৈতন্য আমার হৃদয়ে আবির্ভূত। আমি তাঁহার নিকট যাইয়া শীতল হইব। তুমি চলিয়া যাও। এখন সমস্তই অবসান, তুমি চলিয়া যাও। তোমাকে দেখিয়া আমার চক্ষে জল আসিতেছে, মায়া-বন্ধনে আর বাঁধিও না। কাত্যায়নীকে বলিও, যদি পরলোক থাকে, সেই লোকে ভগ্নীভাবে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।"

হরমণি অনেক আকিঞ্চন করিল, সুশীলচন্দ্র জল বিন্দু পর্য্যন্ত স্পর্শ করিলেন না। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে হরমণি বাহির হইয়া গেল। সাধারণ

দাসীদের ন্যায় কাঁদিয়াই হরমণির স্নেহ-প্রকাশ শেষ হইল। সুশীলের বিষয়ে কাহাকেও কিছু না বলিয়া হরমণি আহারান্তে যেমন প্রত্যহ শয়ন করিয়া থাকে, তেমনই শয়ন করিল। সুশীলচন্দ্র দ্বাররুদ্ধ করিলেন, শয়ন করিলেন না, বিশ্রামের ইচ্ছাও হইল না, অর্দ্ধ রাত্রি পর্য্যন্ত গৃহের ইতস্ততঃ পরিক্রমণ করিলেন। জীবনে শান্তি নাই। তত অল্প বয়সে মনে মনে সিদ্ধান্ত হইল, নরলোকে জীবনে শান্তি নাই।

সময় নিশীথ। সুশীলচন্দ্র গৃহমধ্যে দাঁড়াইয়া। কত কি চিন্তা, কত কি নৈরাশ্য তাহার মনে আসিতেছে, যাইতেছে, ক্রীড়া করিতেছে, চঞ্চল-বায়ু-সঙ্গী সাগর-তরঙ্গের ন্যায় কে তাহা গণনা করে!

রজনী তৃতীয় প্রহর। সুশীলের নয়নে অল্প অল্প তন্দ্রার আবল্য আসিল। শয়নে আবল্য হয়, ইহাই সকলে জানেন, কিন্তু সুশীলচন্দ্র শয়ন করেন নাই, বিরামদায়িনী নিদ্রা নিকটেও আইসেন নাই। না নিদ্রা, না তন্দ্রা, তথাপি সুশীল স্বপ্ন দেখিতেছেন, অগাধ নীলবর্ণ জলরাশি, তাহার উপর একটী প্রস্ফুটিত নীলপদ্ম। তাহার উপর একটী পদ্মমুখী কামিনী। পদ্মটী ক্ষণে ক্ষণে ভাসিতেছে, ক্ষণে ক্ষণে ডুবিতেছে। কবিকঙ্কণে শ্রীমন্ত যেমন কালিদহে কমলে কামিনী দর্শন করিয়াছিলেন, আজি রাত্রে দীপচাঁদ গোস্বামীর পুত্র সুশীলচন্দ্র গোস্বামীর সেইরূপ জাগ্রত স্বপ্নে কমলে কামিনী দর্শন।

নিশা প্রায় অবসান। আকাশে চন্দ্র ছিলেন কি না, মেঘে অন্ধকারে সুশীল তাহা দেখেন নাই। সেই নিষ্প্রভ রাত্রে সুশীলচন্দ্র গৃহদ্বার মুক্ত করিয়া রাজপথে বাহির হইলেন।

উষার আবরণে ধরণী তখন অল্প অল্প অন্ধকার। সুশীলচন্দ্র কোন পথ দিয়া কোথায় গেলেন কেহই দেখিলেন না। কেহই জানিলেন না। প্রভাতে গোস্বামী-পুরী অন্ধকার।

হিন্দু শাস্ত্র রত্নাকর। এই শাস্ত্রের দেব দেবী আর মুনি ঋষি সময়ে সময়ে, ভক্তবৃন্দকে দেখা দিয়া পলকের মধ্যে যেমন লুকাইয়া যাইতেন, সুশীলচন্দ্রও তেমনি উষার অন্ধকারে লুকাইয়া গেলেন। গৃহে হাহাকার পড়িল। এক মাস কেহ কিছু সন্ধান পাইলেন না। হরমণি ভয়ে কোন কথা বলিল না। অনেক অনুসন্ধান হইল, অনেক দিকে অনেক লোক গেল, সমস্ত চেষ্টাই বিফল। মাসান্তে সমুদ্রযাত্রী এক কাণ্ডারী আসিয়া গোস্বামীকে সংবাদ দিল, সাগর-সঙ্গমের শতমুখী স্রোতে আকণ্ঠ-জলে সুশীলচন্দ্রকে ঊর্দ্ধনেত্রে জপ করিতে সে দেখিয়া আসিয়াছে। সেই পর্য্যন্ত শেষ, তাহার পর আর অন্য কোন সংবাদ নবদ্বীপে পৌঁছে নাই।

কাণ্ডারীমুখে শেষ সংবাদ শ্রবণ করিয়া গোস্বামী নিঃসন্দেহ স্থির করিলেন, গণক ঠাকুরের কথা এতদিনে সত্য হইল! দৈবজ্ঞের ভবিষ্যৎ গণনা কি কখনও মিথ্যা হয়। শিশুকালে সুশীলচন্দ্র সমুদ্রে পড়িয়াছিলেন, সমুদ্র বোধ হয় দয়া করিয়া গ্রহণ করেন নাই; বিশেষতঃ সুশীলের গলায় তখন রক্ষা-কবচ ছিল। এখন কবচ-শূন্য; এবারে সুশীলচন্দ্র নিশ্চয়ই আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছে! এজন্মে আর তাহাকে প্রাপ্ত হইবার কোন উপায় নাই!

পুত্রশোকে দীপচাঁদ গোস্বামী সংসার-বিরাগী হইয়া দেশত্যাগী হইলেন। তাঁহার পত্নী সুশীলের শোকে বিষ পান

করিয়া আত্মহত্যা করিলেন। কাত্যায়নীর বিবাহ হইল কিনা, তাহার সংবাদ নাই।

এক বৎসর গেল। আজমীরের পুষ্কর তীর্থে এক জন ভস্ম-ভূষিত সন্ন্যাসী পরিভ্রমণ করিতেছেন। এক দিন সন্ধ্যাকালে তিনি সাবিত্রী পর্ব্বতের উপত্যকাভূমে উপবিষ্ট। ধ্যানযোগে নিমগ্ন। চক্ষে অনবরত বারিধারা। বক্ষঃস্থলে যুগলহস্ত অঞ্জলিবদ্ধ। যোগীবর যোগমগ্ন হইয়া ধ্যান করিতেছেন। যোগে ধ্যানে অশ্রুপাত কেন? ঈশ্বরপ্রেমে? না, তাহা ত বোধ হয় না। মুখে মৃদু মৃদু বাক্য নির্গত হইতেছে। কি ধ্যান করিতেছেন? কয়েকটী বাক্য স্পষ্ট স্পষ্ট শ্রবণগোচর হইল। যোগী বলিতেছেন, "আমি মূঢ়, আমি বাতুল, মানুষ মরিলে কি হয়, জানিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, বাঙ্গালা বই অন্বেষণ করিয়াছিলাম। কিন্তু কোথায় সে তত্ত্ব পাইব? বনবাসী রামচন্দ্র মৃত পিতার সজীব মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। বেদব্যাস। রাজা যুধিষ্ঠিরকে মৃত কৌরব বীরপুরুষগণের ও রণশায়ী কুরু সৈন্যগণের সজীব মূর্ত্তি দর্শন করাইয়াছিলেন। আমি তাঁহা-দিগের ন্যায় পুণ্যাত্মা নই, আমি কিরূপে পরলোকের গতি নিরূপণ করিতে সমর্থ হইব? পরলোকের গতি নিরূপণ অনেক দূরের কথা, আমার জীবিত পুত্র যৌবনাঙ্কুরে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল, বহু অনুসন্ধানেও তাহার নিরাকরণ করিতে পারিলাম না!" যিনি এই কথাগুলি বলিলেন, তিনি নবদ্বীপের দ্বীপচাঁদ গোস্বামী।

আবার গোস্বামী যোগীবরের রসনায় তিনটী বাক্য উচ্চারিত হইল। "ধিক্ বাঙ্গালা বই!"

দশম পরিচ্ছেদ।

পরিশিষ্ট।

"ধিক্ বাঙ্গালা বই!" আমাদিগেরও প্রতিধ্বনি করিতে ইচ্ছা হয়, "ধিক্ বাঙ্গালা বই!" কিন্তু গোস্বামীর বাক্যে প্রতিধ্বনি করিতে ইচ্ছা হয় না। দীপচাঁদ গোস্বামী বর্ত্তমান সময়ের অশীতি বর্ষ পূর্ব্বে নবদ্বীপে বিদ্যমান ছিলেন। তৎকালে বাঙ্গালা বই নিতান্ত সীমাবদ্ধ ছিল। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দ দাস, জ্ঞানদাস, ও রমানন্দ দাস প্রভৃতি কবি-প্রণীত কতিপয় বৈষ্ণব গ্রন্থ, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, এবং কাশীরাম দাসের মহাভারত প্রভৃতি কয়েকখানি উপাদেয় গ্রন্থ তৎকালের বঙ্গীয় কাব্য-সাহিত্য-ভাণ্ডারের আদরণীয় সম্পত্তি। সেগুলিকে কদাপি ধিক্কার দেওয়া যায় না। দীপচাঁদ গোস্বামী বোধ হয় ভাবগ্রাহী নহেন, সেই নিমিত্তই অনভিজ্ঞের ন্যায় কহিলেন, "ধিক বাঙ্গালা বই!"

এখন বরং আমরাই বলিতে পারি, ধিক্ বাঙ্গালা বই! শ্রীরামপুরের মিশনরি সাহেবেরা, রাজা রামমোহন রায়, রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, নন্দকুমার কবিরত্ন, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, অক্ষয় কুমার দত্ত, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বাবু কালী প্রসন্ন সিংহ, ডাক্তর রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বাবু দীনবন্ধু মিত্র, বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডাক্তর রামদাস সেন, পণ্ডিত রাম-

গতি ন্যায়রত্ন, বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত, এবং বাবু কালী প্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতি জীবিত ও মৃত গ্রন্থকার মহোদয়গণের যত্ন, উৎসাহ, ও অধ্যবসায়ে বঙ্গভাষা যদিও দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে, যদিও দিন দিন নগরে ও প্রদেশ মধ্যে অসংখ্য অসংখ্য বাঙ্গালা পুস্তক বিরচিত, অনুবাদিত হইয়া নগরীয় ও প্রদেশীয় অসংখ্য দোকান আলো করিতেছে, যদিও নিত্য নিত্য নানাবিধ সমাচারপত্রে রাশি রাশি বাঙ্গালা পুস্তকের সমালোচন ও বিজ্ঞাপন ভারে পাঠকমণ্ডলী চাপা পড়িয়া যাইতেছেন, তথাপি ধিক্ বাঙ্গালা বই! অধিকাংশই অপাঠ্য। যথার্থ সারবান্ পাঠ্য পুস্তকের সংখ্যা সামান্যতঃ অঙ্গুলী-দ্বারা গণনা করা যায়। অধিকাংশই অসার, অধিকাংশই অযথা অনুবাদ, অধিকাংশই উচ্ছিষ্ট, এবং অধিকাংশই চর্ব্বিতচর্ব্বণ।

বাজারে আজ কাল বাঙ্গালা নাটক ও উপন্যাসের ছড়া-ছড়ি। অকর্ম্মণ্য লোকেরা এই দুই শ্রেণীর পুস্তককে বাস্তবিক ক্রীড়া-বস্তু সাজাইয়া লইয়াছে। বিদ্যালয়ের ডিম্বেরাও নাটক উপন্যাস লিখিতে অসম সাহসে অগ্রসর। ফলতঃ এই দুটী বিষয় এত শক্ত যে, প্রকৃতি-দেবীর পূর্ণ আরাধনা ভিন্ন কোন মতেই সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। উপন্যাসে কেবল পদ বিন্যাস করিলেই সাহিত্য-সমাজে গ্রন্থকার বলিয়া আদরণীয় হওয়া যায়, এইরূপ অনেকের সংস্কার। সেই ভ্রমাত্মক সংস্কারে কলিকাতার বটতলা বাজার উজ্জ্বল করিয়াছে। বস্তুতঃ স্বভাবের সুচিত্র দেখাইতে না পারিলে, সজীব আখ্যায়িকা রচনায় হস্তক্ষেপ করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। তবে ঠাকুরমার "রূপকথা" গুলি পুজনীয়-বর্জ্জনীয়।

উপন্যাস অপেক্ষা নাটক রচনা আরও কঠিন। নাটকে গ্রন্থকারের নিজের কথা একটীও থাকে না; সকল কথাই অপরের মুখে বলাইতে হয়। তাহার উপর দেশ কাল পাত্র সমন্বয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা চাই। কত জ্ঞান, কত অভিজ্ঞতা, কত বহুজ্ঞতা, কত চরিত্র দর্শন, এবং কতই সতর্কতা নাটকে প্রয়োজন, আধুনিক নাট্যকারেরা ভ্রমেও তাহা বিবেচনা করেন না। নাটক-কার রাজা, নাটক-কার রাণী, নাটক-কার বিদূষক, নাটক-কার মন্ত্রী, নাটক-কার প্রতিহারী, নাটক-কার কঞ্চুকী, নাটক-কার দাসী, নাটক-কার ঋষি, নাটক-কার প্রেমিক, নাটক-কার বিরহী, নাটক-কার বীর, নাটক-কার ভীরু, নাটক-কার সাধু, নাটক-কার চোর, নাটক-কার মানুষ, নাটক-কার রাক্ষস, নাটক-কার দেবতা, নাটক-কার দানব, নাটক-কার সব। তাঁহাকে সময়ে সময়ে সকল সাজে সাজিয়া আকাশে, মহীতলে, এবং রসাতলে বিচরণ করিতে হয়, সর্ব্বক্ষণ প্রকৃতির সহিত খেলা করিতে হয়, যাহার যেরূপ স্বভাব তাহার প্রকৃত অনুকৃতি দেখাইয়া দিতে হয়। যাহাতে এইগুলি থাকে, তাহার নাম নাটক। আজি কাল কেবল আমরা কতকগুলি বিকৃত-ক্রিয়া-সংযুক্ত পদ-বিন্যাস দর্শন করিয়া নাটক নামের সার্থকতা অনুভব করিতেছি। পঞ্চবিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে এক জন বঙ্গীয় কবি নাটকের এরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া আক্ষেপ সহকারে কহিয়াছিলেন, "এ নাটক নাটক না মিটে।" বহুদিন পূর্ব্বে সেই কবির মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার ঐ বাক্যটী আজিও বঙ্গীয় নাট্য-সংসারে অন্বর্থ হইয়া উজ্জ্বল প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছে।

ইতিহাস ও বিজ্ঞানের ত কথাই নাই। বঙ্গভাষায় এই দুই বিষয়ের অস্তিত্ব আছে, একথা বলিলে স্পষ্ট মিথ্যা বলা হয়। ভাষার উৎকর্ষ সাধন অথবা অর্থলোভের অন্যতর যে কারণেই হউক, বিদ্যালয়ের বালকদিগের জন্য যে দুই এক খানির প্রকাশ দর্শন করা যায়, তাহা শুদ্ধ ইংরাজীর উদ্গীরণ মাত্র। ভারতবর্ষ এত বড় রাজ্য, এখানে এত লোক শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছেন, সেই পৌরাণিক রামায়ণ মহাভারত ব্যতিরেকে ভারতবর্ষের আর একখানিও ইতিহাস নাই! ইহা কি দেশের পক্ষে সামান্য লজ্জা? সামান্য কলঙ্ক? আজকাল বঙ্গ-সাহিত্য-সংসারে পঞ্চাধিক গ্রন্থকার প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাস নেত্রগোচর হয়। সকলগুলিই ইংরাজী ইতিহাসের অবিকল অনুবাদ। ইংরাজ যেখানে ভুলিয়াছেন, ইংরাজ যেখানে যাহাকে ভাল বলিয়াছেন, ইংরাজ যেখানে যাহা নিন্দা করিয়াছেন, বঙ্গীয় গ্রন্থকারের অনুবাদিত ইতিহাসে ঠিক ঠিক তাহার প্রতিধ্বনি হইয়াছে। অনুকরণ অবশ্যই করণীয়। ভাল বিষয়ের অনুকরণ না করিলে কখনই সংশোধন, সংস্কার, অথবা উন্নতি হইতে পারে না; ইহা স্বীকার্য্য; কিন্তু অযথা অনুকরণ কিম্বা চিরকাল অনুকরণের দাসত্ব, উভয়ই দোষাবহ; সেই জন্যই আমরা পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, "ধিক্ বাঙ্গালা বই!"

আর এক মহাদোষ। আজ কাল আমাদের সমাজের ঐশ্বর্য্যশালী বড় লোকেরা লেখা পড়ার চর্চ্চা করিতে প্রায়ই ঘৃণা বোধ করেন। আলস্য, বিলাস, বৃথা ক্রীড়া, বৃথা আমোদ তাঁহাদিগের অধিকাংশেরই একান্ত প্রিয়। লেখা পড়ার চর্চ্চা করিতে তাঁহাদিগের ঘাড়ে যেন বাজ পড়ে। যাঁহারা সে চর্চ্চা

রাখেন, তাঁহারা অবশ্যই সাধুবাদের পাত্র; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদিগের সংখ্যা এক সহস্রের মধ্যে একটী কি দুইটী অন্বেষণ করিয়া লইতে হয়। গ্রন্থ প্রণয়ন করা এদেশের ধনবান লোক-দিগের পক্ষে অত্যন্ত অপমানের বিষয়। তাঁহারা ভাবেন, কৃষি, বাণিজ্য, এবং গ্রন্থ প্রণয়ন নিম্ন শ্রেণীর দরিদ্র লোকদিগেরই কার্য্য; সম্ভ্রান্ত বড় লোকে তাহাতে প্রবৃত্ত হইলে সম্ভ্রমের হানি হয়। এমন বিষম ভ্রম আর নাই। শেষের কথাটির উল্লেখ করাই এ পুস্তকের প্রসঙ্গাধীন; অতএব তাহাই আমরা সপ্রমাণ করিব। ইউরোপ খণ্ডের রাজা, ডিউক, লর্ড, আরল, ব্যারণ, নাইট, পীয়র প্রভৃতি উচ্চ পদস্থ মহা সম্ভ্রান্ত লোকেরা কবি ও গ্রন্থকাররূপে গণনীয় হইয়া স্ব স্ব দেশের প্রচুর উপকার সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন। কাব্য-সাহিত্যের আলোচনায় বড় লোকের সম্ভ্রমের হানি হয়, যে দেশে এমন বড় লোক এবং এমন সম্ভ্রমের অবস্থান, সে দেশ যত শীঘ্র রসাতলে যায়, ততই মঙ্গল। তাদৃশ সম্ভ্রমকে আমরা দূর হইতে নমস্কার করিয়া বিদায় করিতে ইচ্ছা করি।

বাঙ্গালা বই দুর্নামগ্রস্ত কিজন্য, আমরা তাহার যৎকিঞ্চিৎ কারণ নির্দ্দেশ করিলাম; যাঁহাদিগের সম্পত্তি, তাঁহারা গুণগ্রাহী হইয়া যত্নপূর্ব্বক দেশীয় ও জাতীয় কলঙ্ক মোচনে অগ্রবর্ত্তী হন, ইহাই প্রার্থনা।

সমাপ্ত।